কাজের বিস্তার হইল, ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি নানা স্বাধীন ব্যবসায় সৃষ্টি হইল এবং উদরান্নের জন্ত অনেক লোককে পৈতৃক বাটী ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে হইল। সময় যত যাইতেছে, এই প্রথা তত বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথম প্রথম ইহাতে পারিবারিক বন্ধন তত শিথিল হয় নাই, কারণ ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে বিদেশে যাইলেও স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। যাঁহারা বিদেশে থাকিতেন, সুবিধা পাইলেই তাঁহারা দেশে আসিতেন। পূজার সময় বোধ হয় অল্প লোকের ভাগ্যেই বাড়ী না আসা ঘটিত এবং যাঁহারা কার্য্য-গতিকে আসিতে পারিতেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য মনে করিতেন। মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য পরিজনবর্গ পথ চাহিয়া থাকিতেন। "বাবু"রা বাড়ী আসিতেছেন, ইহাতে বাড়ীর লোক জনেরও আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। যাঁহার বাড়ীর প্রতি টান আছে, বাড়ীতে যাঁহার যাওয়া আসা আছে, তাঁহার বাড়ীর ভৃত্য ভৃত্যার প্রতিও টান থাকে। বিজয়ারদিন যখন পূর্ব্বে সকল আত্মীয় স্বজন মিলিয়া উৎসব করিতেন, সে উৎসবের অংশ ভৃত্যেরাও পূর্ণ মাত্রায় পাইত। প্রৌঢ়বয়স্ক অনেকেরই মনে থাকিতে পারে, বাড়ীর বা পাড়ার পুরাতন ভৃত্যদের সহিত তাঁহারা কত আগ্রহের সহিত বিজয়ার কোলাকুলি করিয়াছেন।

কিন্তু এখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে সব লোককে আজকাল বিদেশে থাকিতে হয়, তাঁহারা অনেকেই পরিবার লইয়া থাকেন। নিতান্ত যাঁহাদের অবস্থায় কুলায় না, তাঁহারাই কেবল পরিবার "দেশে" রাখিতে বাধ্য হন। ছেলেদের লেখাপড়ার জন্যই হউক, আর নিজের স্বচ্ছন্দের জন্যই হউক, পরিবার সঙ্গে রাখার প্রথাটা এখন বহুল প্রচলিত। এই প্রথার এক অবশ্যম্ভাবী ফল "দেশের" প্রতি মমতার হ্রাস। এখন আর লোকে ছুটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন না। ছুটী হয় জানই, নতুবা চায় কি? বাটী যাইবার এখন আর তত আগ্রহ অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। যাহাদের জন্য বাড়ী যাওয়া, তাহাদের সকলেই বা অধিকাংশ যখন সঙ্গে রহিল, তখন আর বাড়ীর জন্য, গ্রামের জন্য মন কেমন করিবে কেন? এই কারণে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বাড়ীর ভৃত্যদের প্রতি পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহাও এই সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। অবস্থাটা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকে বৎসরান্তে পূজার সময় একবার বাড়ী যাওয়াও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাহার অর্থের অনাটন, কাহার আলস্য, কাহার বা দেশের ম্যালেরিয়ার ভয়। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, তাঁহাদিগের অনেককে পূজার সময় হাওয়া খাইতে যাইতে দেখা যায়। যাঁহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া সহরে থাকিতে হয়, সেখানে অবশ্য তাঁহারা অবস্থানুযায়ী লোকজন রাখেন, কিন্তু সহরে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ

চুক্তিমাত্র, উভয়ের মধ্যে মমতা জন্মান অসম্ভব। প্রভুর একটু অসুবিধা হইলেই চাকর বদলান এবং চাকরের একটু পানেতে চুণ খসিলেই সে চলিয়া যায়। কার্য্যোপলক্ষে যাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের মধ্যে কতক অংশ গবর্ণমেণ্টের চাকরি করেন। যাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী, তাঁহাদিগের কতক অংশকে আবার এ জেলা ওজেলা ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সেই জন্য তাঁহাদিগকে অনেক বার লোকজন বদলাইতে হয়। এক জেলা হইতে অন্য জেলায় গেলেন, পুরাতন লোকজন কেহ সঙ্গে গেল না, নূতন স্থানে আবার নূতন লোক রাখিতে হইল। ইঁহাদের ও ইঁহাদের ভৃত্যদের মধ্যে কোনরূপ স্নেহবন্ধন এক প্রকার অসম্ভব বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এক প্রকার শেষ হইল। আরও অনেক কথা বলিবার থাকিতে পারে এবং আছে বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহা আমার ক্ষমতাতীত। আমার বিদ্যা শেষ হইয়াছে। তবে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। উপরে অনেক সামাজিক, অনেক মানসিক পরিবর্ত্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের কি ফল আমার ক্ষমতানুসারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমার মত এই যে, এই সব পরিবর্ত্তনের গতি মন্দের দিকে বা ইহার সব মন্দ। ইহা আমি কখনই বলিতে পারি না। বরং আমার বিশ্বাস যে, অনেকগুলি পরিবর্ত্তন ভালই। দুই একটার কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। নিম্নশ্রেণীর লোকের মনে যে আত্ম-সম্মানের বোধ জন্মিতেছে, তাহা একটা সামাজিক মঙ্গলের লক্ষণ। অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ তাহারা যে দূরদূরান্তরে যাইতেছে, তাহাও একটা বিশেষ সুলক্ষণ। অপর দিকে শিক্ষিত বা উচ্চ সম্প্রদায়ের লোক যে বিদেশে যাইতে হইলে এখনপ্রায় পরিবার সঙ্গে লইয়া যান, এই নূতন প্রথাটী সুবিবেচিত বলিয়া মনে হয়। ইহা যে সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। অবস্থাপন্ন বা মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোক যে স্বাস্থ্যোদ্দেশে আজকাল সুবিধা পাইলেই স্বাস্থ্যকর স্থানে যান বা যাইবার চেষ্টা করেন, তাহাও মঙ্গলময় বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তবে সকল পরিবর্ত্তনেরই— বস্তুতঃ সকল জিনিষেরই দুই দিক্ আছে। মর জগতে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন ভাল নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমায় কতকগুলি সামাজিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের দুই একটা কুফলের কথা বলিতে হইয়াছে। একটা প্রথা বা অবস্থার নানা ফল, কতক-গুলা সু, কতকগুলা কু। একপ্রকার ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাকে হয় বড় মন্দ, নয় বড় ভাল মনে হইবে। মোটের উপর উহা ভাল কি মন্দ স্থির

করিতে হইলে উহার কুফল বেশী কি সুফল বেশী, ইহাই দেখিতে হয়। এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে কোন একটা প্রথার বা পরিবর্ত্তনের ফল যদি সু অপেক্ষা কু বেশী হয়, তাহা হইলেও অনেক সময় সমাজ উহা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

প্রবন্ধ কতকটা বড় হইয়া পড়িয়াছে। আর একটা কথা বলিয়াই ইহার উপসংহার করিব। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বিষয়ে বর্ত্তমান কালে যে বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার কি কোনও প্রতীকার আছে? সমাজনীতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা যায়, তাহা আর প্রায় ফিরে না। একটী প্রথা বা অবস্থা কারণসমবায়ের ফল। সমাজ সদা পরিবর্ত্তনশীল। কোন সমাজে পরিবর্ত্তনের গতি দ্রুত, কোন সমাজে মৃদু এইমাত্র প্রভেদ। সেই জন্য এক সময়ে বা এক সমাজে যে কারণসমষ্টি উপস্থিত থাকে, অন্য সময়ে বা অন্য সমাজে ঠিক্ সেই কারণসমষ্টির উপস্থিতি এক প্রকার অসম্ভব। কাজে কাজেই কোন একটী বিশেষ প্রথা বা অবস্থা একবার চলিয়া গেলে আর তাহা প্রায় ফিরিয়া আসে না, এবং একটা প্রথা বা অবস্থা চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত সুফল ও কুফল চলিয়া যায়। প্রথা বা অবস্থা অন্তর্হিত হইল, কিন্তু আমরা তার সুফলগুলিকে তার সঙ্গে যাইতে দিব না, ইহা একবারেই অসম্ভব। অবস্থাবিশেষে এক সমাজে আতিথেয়তা বড় প্রবল হয়। যদি তাহার অবস্থান্তর হয়, সেই সঙ্গে আতিথেয় প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। প্রবৃত্তিটী খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্কীর্ণ মানবহৃদয়ে প্রবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক প্রবৃত্তিকে, তাহা সুই হউক আর কুই হউক, স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়। অবস্থাবিশেষে সমাজ নিষ্ঠুরতা-পূর্ণ হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক, সেই সমাজেরই লোক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি করিয়া এত নিষ্ঠুর ছিল বুঝিতে অক্ষম হইবে। এই সব কারণে আমার মনে হয় যে, যে অবস্থায় আমাদের সমাজে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কে বেশ একটু মধুরত্ব ছিল, অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরত্বের নিকট আমাদিগকে বিদায় লইতে হইবে। যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহা ফিরিবার নয়।

উপরে যে উত্তর দেওয়া গিয়াছে, তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে, অনেকের ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে। আমার নিজের উত্তর যদি ভুল হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইব, কিন্তু আমারত উহা ভুল বলিয়া মনে হয় না। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আমরা সকলে যদি চেষ্টা করি, তাহা হইলে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ যে চুক্তিমাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে, হৃদয়ের ছায়া উহা হইতে যে একবারে চলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা কতক নিবারিত হইতে পারে। আমাদিগের নিজকে এরূপ

শিক্ষা দিতে হইবে যে, আমরা যেন কখন ভুলিয়া না যাই যে, আমাদের লোকজন আমাদেরই ন্যায় মানুষ, জন্তু নয়, কল নয়। তাহাদের সুখ দুঃখ আছে, অভাব আকাঙ্ক্ষা আছে এবং সেই সকলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদের অধীন, তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার—তাহাদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ মনুষ্যত্ব-বিহীনতার চিহ্ন। সকলের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের পক্ষে ভালবাসা যে এক প্রধান সহায়, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। কবি বলিয়াছেন :—

কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট,
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট ?

* * * *

ধরা চায় সরল হৃদয়-রস।

এই অমূল্য কথাগুলি যদি আমরা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখি, তাহা হইলে হৃদয়ের শিক্ষা অনেক সময় সহজ হইয়া পড়িবে। ভাল ব্যবহার চাই, ভাল কথা চাই, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমরা যদি আমাদের অনুচরবর্গের প্রতি স্নেহনেত্রে দেখিতে আরম্ভ করি, আমাদের ছেলে মেয়ের পক্ষে উহা অনায়াসসাধ্য হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে যাইতেছিলেন। পথে তাঁর পূর্ব্ব-পরিচিত রামধন মুদিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে 'রামধন খুড়া' বলিয়া তার কাছে উপস্থিত হইলেন। রামধন তার দোকানের সম্মুখে ঘাসের উপর চট বিছাইয়া দিল, বিদ্যাসাগর তার উপর বসিয়া তার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। তার পর সেই দিকে যাইলেই তিনি তার সংবাদ লইতেন। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন। সকলের পক্ষে বিদ্যাসাগর হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব তাঁর এই সহৃদয় ভাব অনুকরণ করিতে পারিলে কি একটু ভাল হয় না ? একজন ইংরাজ মুনীব তাঁর দেশীয় ভৃত্য-বর্গকে যে চক্ষে দেখেন, সে চক্ষু আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

আর এক কথা। দেশকাল পাত্রভেদে ব্যবহারের তারতম্য হওয়া উচিত। নিম্ন-শ্রেণীর লোকের এখন আত্ম-সম্মান বোধ জন্মিতেছে। তাহাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার এরূপ হওয়া উচিত যে, ঐ আত্ম-সম্মান বোধে আঘাত না লাগে। তাহাদের চাল চলনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের স্বচ্ছন্দ বোধ বেশী হইয়াছে, এ কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এমন লোক অনেক আছেন, একজন চাকর জুতা পরিলে বা পিরাণ গায়ে দিলে তাঁহাদের গায়ে তপ্ত জলের ছড়া পড়ে। এরূপ হইলে আজকাল চলিবে কেন ?

চাকরদের বেতন সম্বন্ধেও মুনীবদের বিবেচনা করার সময় হইয়াছে। একজন ঝির ২।৩ টাকা বা একজন ভৃত্যের ৩।৪ টাকা বেতন কম বলিয়া মনে হয়। ঝির বাড়ীতে তার ছেলে মেয়ে বা আত্মীয় স্বজন আছে, চাকরের পরিবারবর্গ আছে। আজ কালকার দিনে সামান্য বেতনে তাহাদের

চলা অসম্ভব। কাজে কাজেই তারা সহজে চাকরি করিতে চাহে না। প্রভু-শ্রেণীকে অনেক উপদেশ দেওয়া গেল। মাত্রা বেশী হইলে তাঁরা চটিয়া যাইবেন। ভৃত্যশ্রেণীকে কিছু উপদেশ দেওয়া উচিত কি? উচিত হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, কারণ তারা যে বামাবোধিনী পাঠ করে, অদ্যাবধি আমি সে প্রমাণ পাই নাই। তবে আমার বিশ্বাস মুনিবেরা তাহাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করিলে ও সহানুভূতি দেখাইলে অল্পে অল্পে তাহাদের প্রতি তাহাদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। ভাল পরিবারের মধ্যে থাকিতে পাইলে তাহাদের মনের ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন হইবে। সকল কাজের আরম্ভই কঠিন এবং একটা সৎ-কার্য্যের আরম্ভ শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরই করিতে হইবে।

বামাবোধিনীর পাঠিকাবর্গকে দুই একটী কথা বলিয়া সত্য সত্যই প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব। যে সব বিষয়ে হৃদয়ের প্রাধান্য, তাহাতে স্ত্রীলোকের অগ্রসর হওয়া দরকার। যদি প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধের উন্নতি করিতে হয়, যদি উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের ইহাতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বাড়ীর গৃহিণীর যদি চাকরদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহারে আপত্তি থাকে, প্রত্যেক হাতে যদি তিনি উহার প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে কর্ত্তা বেচারীকে দায়ে পড়িয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে, পুত্র কন্যারা তাঁর সস্নেহ আচরণের অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না, এবং তাঁর কোমল ব্যবহার চাকর চাকরাণীকে আজ হউক কাল হউক বা দশ দিন পরেই হউক বশীভূত করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে। আমার পরিচিত এক হিন্দু পরিবারের কর্ত্তা ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ও বড় সেক্‌সপিয়ার-ভক্ত ছিলেন। অনেক সময় সন্ধ্যার পর কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে পরিবারবর্গকে তিনি সেক্‌স্‌পিয়ার অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। মুখে মুখে অনুবাদ কালে যদি কখন তিনি "দাসী" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার গৃহিণী তখনই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন "আহা 'দাসী' শব্দটা বড় রুক্ষ, উহা ব্যব-হার কর কেন, 'ঝি' শব্দ বেশ কোমল, উহা ব্যবহার করা উচিত।" আমার মনে হয় এই গৃহিণীর ছেলেপিলেরা বাল্য-কাল হইতেই পরিজনের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতে অনভ্যস্ত হইয়াছিল। সকল সুশৃঙ্খল সংসারে গৃহিণীর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ। তিনি যদি কোন আচরণের প্রতিবাদ করেন, তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ভরসা কাহারও হয় না। মনে করিলে গৃহস্বামিনী বাড়ীর সকলকে উপরি-উক্ত রূপে সংযত করিতে পারেন। সেই জন্য বামাবোধিনীর পাঠিকাসকলকে আমার সানুনয় নিবেদন প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধের উৎকর্ষসাধনে তাঁহারা বিশেষরূপে যত্নবতী হউন। দ।

আমার দাদা।*

১

দাদা! চলিলে কোথায়?—
মহা সর্ব্বনাশ করি
এ সর্ব্বস্ব পরিহরি,
জননী, ভগিনী, জায়া, পুত্র, কন্যা তা'য়;
সুখময় ঘর বাড়ী,
সাধের সাগরবাড়ী
অবহেলে সব ফেলি ধূলামুঠি প্রায়,
উদাসীন বেশে দাদা! চলিলে কোথায়!

২

দাদা! চলিলে কোথায়?—
সুখের জীবন তব,
নিত্য সুখ নব নব,
এমন জীবন নরে কত পুণ্যে পায়!
সৌম্য মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তিভরা,
রাজ-সভা আলো-করা,
সদা হাসি, কথা মাখা স্নেহ-মমতায়;
চরিত্র কলঙ্কহীন,
সুস্থ, শুদ্ধ চিরদিন,
এহেন জীবন আহা, কত পুণ্যে পায়,
তবে কেন অনায়াসে চলিলে কোথায়!

৩

দাদা! চলিলে কোথায়?—
মা তোমার অভাগিনী,
শোকতাপে পাগলিনী,
একমাত্র তুমি তাঁর আঁখি-তারা প্রায়!
তুমি যে দীনের রত্ন,
তাই মা'র হেন যত্ন,
অনাহারে অনিদ্রায় রক্ষিছে তোমায়!
দেবতার পায়ে পড়ি,
দিতেছে মা গড়াগড়ি,
তোমার আরোগ্য আয়ু দিবা নিশা চায়;
সে তীব্র তপস্যা-তাপে
ব্রহ্মাণ্ড আতঙ্কে কাঁপে,
হিমাদ্রির উচ্চ চূড়া গুঁড়া হয়ে যায়,
কোন্ রাহু পারে দাদা গ্রাসিতে তোমায়!

৪

দাদা! চলিলে কোথায়?—
আমি যে দিয়াছি ফোঁটা,
"যমের দুয়ারে কাঁটা,"
সে দিন কার্ত্তিক মাসে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়;
না হ'তে ছ'মাস পূর্ণ,
সে দর্প কি হবে চূর্ণ,
সবি কি হইবে শূন্য মাঘী পূর্ণিমায়!
আমি নিজ আয়ু দিব,
দাদা! তোমা বাঁচাইব,
থাক তুমি মা'র কোলে অমৃতের ছা'য়!
যেওনা যেওনা ভাই,
আর সহোদর নাই,
কেমনে সান্ত্বিব তব অভাগিনী মা'য়!
এক মাস রোগাতুর, যাবে বা কোথায়?

* আমার দাদা—স্বর্গীয় প্রমথমোহন দত্ত চৌধুরী ১৩১০ সালের ১৮ই মাঘ, মাঘী পূর্ণিমার পবিত্র দিনে, দিবা ২টার সময়ে, পরলোকে গমন করেন। লেখিকা।

৫

দাদা ! চলিলে কোথায় ?—
উঠ দাদা ! উঠ ভাই,
ভাই বোনে ঘরে যাই,
তুমি যে চাহিলে ভাত—কাতর ক্ষুধায় !—
ফেলি সব বিঘ্ন বাধা,
আমি ভাত দিব দাদা,
কেন তুমি রাগ কর তব অনুজায় ?
অই যে মা অভাগিনী,
বিবসনা পাগলিনী,
ডাকিছে আকুল রবে "বাবা বুকে আয় !"
বউ যে ভূতলে পড়ি,
যাইতেছে গড়াগড়ি,
ভূপেন নৃপেন কাঁদে অনাথের প্রায় !
তোমার স্নেহের মেয়ে,
কাঁদিছে আছাড় খেয়ে,
বালিকা বউ-মা কাঁদে লুটিয়া ধরায় ;
প্রতিবাসী বন্ধুজন,
জ্ঞাতি, ভৃত্য, প্রজাগণ
সকলে নয়ন-জলে ধরণী ভিজায় !
এত করে কাঁদাইয়া,
সুখী হবে কোথা গিয়া,
তোমার কোমল হিয়া ভরা মমতায়,
তবে নিঠুরের মত চলিলে কোথায় ?

৬

দাদা ! চলিলে কোথায় ?—
ভেঙে গেল প্রাণ মন,
আর নাই ভাই বোন,
কেমনে বাঁচিয়া রব, হারায়ে তোমায় !
তোমাহীন বাড়ী ঘরে,
রহিব কেমন করে,
দিন রাতি কাটাইব কার শুশ্রূষায় ?—
চিকিৎসক প্রাণপণে
যুঝিলা শমন সনে,
কত যে বিনিদ্র আঁখি রক্ষিলা তোমায়—
সব শক্তি অবহেলি,
সজাগ পাহারা ঠেলি,
কে চোর অলক্ষ্যে তোমা হরি লয়ে যায়,
এত অপমান দাদা, কার সহে গায় ?

৭

দাদা ! চলিয়ে কোথায় ?—
আজি জানিলাম ঠিক,
মানব-জনমে ধিক্,
অশক্তা অবলা আমি তৃণকণা প্রায় ;
যদি নিজ আয়ু দিয়া,
দাদা, তোমা বাঁচাইয়া,
মরিতাম মা'র কোলে, কি আনন্দ তায় !
পাশবদ্ধা সিংহী সম,
বৃথা আকিঞ্চন মম,
আস্ফালি তরঙ্গ বৃথা মিশিল বেলায় ?
এ বিশ্ব ভোজের বাজি—
মরণের কারসাজি,
খেলার পুতুল মোরা, হাসায় কাঁদায় !
বিধির বিধান শুধু সত্য এ ধরায় !

৮

—চলিলে কোথায় দাদা ! চলিলে
কোথায় ?—
বলে যাও কোথা গেলে
জগতের সব ফেলে,
কোন্ খানে রবে এবে কিবা স্নেহ-ছায় ?
বুঝি যাঁরে নিত্য নিত্য,
পূজিয়াছ ভরি চিত্ত,

ডাকিয়াছ নিরবধি যেই দেবতায় ;
আজি এ রোদন-রোলে,
অভ্রভেদী হরিবোলে,
গেলে বুঝি তাঁরি কোলে, অমৃত-শয্যায় ?
তবে দাদা ! তব ঠাঁই,
জন্মের বিদায় চাই,
যাও গো দেবতা তুমি ত্রিদিব যথায় ;
একেলা রহিনু ভবে,
জানি না কোথায় কবে
অভয়-আশ্রয় তব পাব পুনরায় ।—
যাও গো বাবার কাছে, যাও অমরায় ।

অভাগিনী
শ্রীমা—

পত্র ।

(৪৮৪ সংখ্যা—২৪২ পৃষ্ঠার পর) ।

প্রায় বৈকাল ৫টা "বীণা" ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল। এখান হইতে আর পশ্চিমের হিন্দুস্থানী বা বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দেখা যায় না। সর্ব্বত্র দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় লোক নিযুক্ত। পরিধানে লম্বা ধুতী, গলা-খোলা কোট, মাথায় টুপি, বৃহৎ শিখা লম্বমান, পায়ে চটি জুতা। এতদ্ব্যতীত গোয়ালিস বটলর খানসামা—কতকটা বাঙ্গালীর মত চেহারা, পরিধানে কোট প্যাণ্টুলন, মাথায় বাঁকা সিঁতি ও খোলা পা, বৈকালে কচা টোষ্ট ইত্যাদি লইয়া গাড়ীর নিকট অভ্যর্থনা করিতেছে। এখানে অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ ট্রেণ থাকে। জলযোগের পালা শেষ হইল, আবার দৌড়। ক্রমে দিনমণি বিদায়োন্মুখ, সন্ধ্যার অাঁধারে ধরণীর মুখ ঢাকিয়া গেল। চন্দ্রমার কোমল কিরণ আকাশের গায় ফুটিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার আলোক দেখিয়া ক্ষুদ্র তারকাদল ছোট ছোট মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির নিকট চন্দ্রের আগমন জানাইতে লাগিল। আমাদের কম্পার্টমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে আলোকিত। আলোকে থাকিয়া দুই ধারি বনপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল অাঁধারের লীলা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। সে অাঁধারের বক্ষোভেদ করিয়া কেবল খদ্যোতিকা মাঝে মাঝে সন্তরণ করিতেছিল। রাত্রি ৯টার সময় ভুপালে উপনীত। এখানে সাহেবদের ডিনার (বড় হাজিরা) হয়। এখানে আমার সহযাত্রিণীগণ বেশপরিবর্ত্তন ও কেশবিন্যাস করিয়া প্রস্তুত হইলেন। অন্য গাড়ী হইতে তাঁহাদের স্বামীরা আসিয়া আহারে লইয়া গেলেন। আমরাও ইত্যবসরে গাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া সারিলাম। অপর সকলেই আপন আপন শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন ; কিন্তু নাযা উঠার কার্য্য বন্ধ রহিল না। এইরূপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। ভোর ৭॥ টায় মনমারে গাড়ি পৌছিল। মান্দ্রাজযাত্রীরা এইখানে গাড়ী বদল

করিলেন। এখন আমরা ক্রমেই বম্বের নিকট হইতেছি। এইবার চন্দ্রদেবকে বিদায় দিয়া সূর্য্যদেব ধরায় উপস্থিত। প্রভাকরের স্বচ্ছ কিরণমালা উষাবালার কোমল বিকাশে ধরিত্রীর মৃণালগ্রীবায় পতিত হইল, অমনি সমস্ত জগতের হৃদয় আবার নবোদ্যম নবোৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

এইখান হইতে পথের নূতন শোভা, নূতন সৌন্দর্য্য নয়নে পতিত হইল। আর যেন আঁখি ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। এই সকল ভূভাগ সমতল প্রান্তর নহে, এখান হইতে পাহাড় কাটিয়া রেলপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই পার্ব্বতীয় বনপথের ক্রোড়দেশ দিয়া ট্রেণখানি দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। পথিক এক মুহূর্ত্ত যে চক্ষু মেলিয়া সে সুখ উপভোগ করিবেন, তাহার যো নাই। এই উচ্চ নীচ আঁকা বাঁকা প্রস্তরময় প্রকৃতির বদন আড়ম্বরবিহীন ও অলঙ্কারশূন্য। হেথায় পুষ্পসৌরভও নাই। পৃথিবী-বক্ষ-বেষ্টনী আদরিণী লতামালা বিরল। নির্জ্জন বনপথ ও গম্ভীরা প্রকৃতির মুখ। সেই পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে নবীন ও প্রাচীন বৃক্ষগুলি ঊর্দ্ধমুখে সেই বিশ্ব-দেবের করুণা চিন্তা করিতেছে, যোগী যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তপস্যা সাধিতেছে। এই সকল পর্ব্বতমালার গম্ভীর শান্ত শোভা দেখিয়া ঈশ্বরের কত কি বৈচিত্র্য-লীলার পরিচয় হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনময় জগতের নিয়মানুসারে এই শুষ্ক লীলাময় ভূখণ্ডের আবার পরমমোহিনী মূর্ত্তি উদিত হয়। স্নিগ্ধ বর্ষাকালে বর্ষার নির্ম্মল বারি প্রভাবে এই পর্ব্বতশ্রেণীর একেবারে বিভিন্ন রূপান্তর দৃষ্ট হয়। চূড়াদেশ হইতে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত শ্যামল গুল্মলতা নানাবিধ দূর্ব্বাদলে একেবারে আচ্ছাদিত হয়। সে সময় ইহাকে ওষধি বনস্পতির পর্ব্বত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উপরে কৃষ্ণ-মেঘ চন্দ্রাতপ, বারিধারা যেন মুক্তাঝালর-বৎ সেই শ্যামল গাত্র বহিয়া ঝর ঝর বেগে চলিয়াছে। সেই বিমল শোভা এখনকার সঙ্গে তুলনা করিলে অনুভবে আইসে না।

ক্রমে ট্রেণখানি গস্তলা স্থানের নিকট হইতে লাগিল। এই স্থান হইতে বম্বে পর্য্যন্ত ক্রমাগত বারটি টনেল পার হইয়া আসিতে হয়। সেই নিবিড় ঘন আঁধারে গাড়িখানি পড়িবামাত্র মেম সাহেবটি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চক্ষু বুজিয়া লইলেন। তাহার খেয়াল দেখিয়া বেশ আমোদ বোধ হইতে লাগিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে আর একবার আসিয়াছিলেন। অনেক স্থলে গাইডগিরিও করিতেছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, আমরা ১টার সময় বম্বে পৌঁছিলাম। প্রথমে দেখিলাম অদূরে কেবল নারিকেল বৃক্ষের বন ও এক দিকে সমুদ্রের অগাধ জলরাশি বহিয়া যাইতেছে। সেই অনন্ত পারাবারের অম্বুরাশি দেখিয়া প্রাণে যেন সজীবতার সঞ্চার হইল।

অভিনব দৃশ্যের শোভার আশায় সুধারি সমুৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধের দ্বারদেশ কেবল শত শত মিলের স্তম্ভে পরিশোভিত। (ক্রমশঃ

মিলন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(শয়ন কক্ষে লাবণ্যবতী ও চপলা)

চপলা।

কেন আজ ম্লান মুখ বিষণ্ণ চাহনি,
আত্মহারা কোন্ দুঃখে,
রহিয়াছ অধোমুখে,
বাজিছে পরাণে কিবা বিষাদ-রাগিণী,
কি ব্যথা বাজিছে বুকে বল গো স্বজনি ?
আজন্ম লতার মত বেড়িয়া তোমারে
রয়েছে জীবন মম,
ধ্রুব তারকার সম,
একমাত্র আলো-কণা তুমিই আঁধারে,
মোর জুড়াবার স্থল এ বিশ্বমাঝারে।
অভাগিনী পিতা মাতা হারায় শৈশবে,
তুমিই সোদরা প্রায়
দুঃখিনীর এ ধরায়
নতুবা ধূলির সাথে মিশিতাম কবে,
কেন তব কথা মোরে লুকাতেছ তবে ?
বেশী দিন নাহি আর, মন্দোর-কুমার,
এ তব বিরহ-ব্যথা
ঘুচাবেন আসি হেথা,
চিরসুখী হবে সখি ! জীবন তোমার।
ওকি কেন ম্লান মুখ, চোখে অশ্রুধার ?
কি দুঃখ বেদনা সখি ! পাইলে পরাণে ?

লাবণ্যবতী। "ও কথা বলোনা আর,
মোর কাছে বার বার,
অশনীর মত মোর বাজিছে শ্রবণে,
অশান্তির কালো ছায়া ঢাকিছে নয়নে।"

চপলা। "তবে মন্দোর-কুমারে সখি !
বাস নাকি ভাল ?
আর কারে প্রাণ মন
করেছ কি সমর্পণ,
তাই কি অশান্তি-ছায়া ভাসিতেছে কালো,
মিনতি করি গো সখি ! কে সে মোরে বলো ?
তাই বুঝি লাজ-রক্ত মলিন মু-খানি,
কম্পিত অধর-তলে
মৃদু হাসি খেলে ছলে,
নব অনুরাগে সখি ! মগন আপনি,
কোন্ স্রোতে ছুটিতেছে কাহার বাহিনী ?
একি কণ্ঠহার সখি ! কোথায় তোমার ?
কোন্ চোরে করে চুরি,
কার বল এ চাতুরী ?
এ দশা করিল হেন প্রেম-প্রতিমার,
চিরসুখী ভাগ্যধর কেবা সে ধরার ?"

লাবণ্যবতী।

"বলি তবে সখি ! তোরে সেই একদিন,
সীমান্তের শৈশবের,
উপকূলে কৈশোরের,
সবি হেরি চারু ছবি সকলি নবীন,
সবি নব পুলকিত, ম্লান-ছায়া-হীন।

সহসা আঁখির পথে কে হল পথিক,
সখি! যাঁর যশোগান,
শুনিয়া মোহিত প্রাণ,
যাঁহার বীরত্ব-কথা ঘোষে চারি দিক্,
সেই শেষে হল এসে নয়নে পথিক।
কি করে অবোধ হিয়া রাখিব বাঁধিয়া?
তাই দেহ প্রাণ মন
করিয়াছি সমর্পণ,
তাই সখি! সর্ব্বত্যাগী সে প্রেম লাগিয়া,
এই দেখ বীরমূর্ত্তি নয়নে চাহিয়া।
বলিয়া গৌরবভরে খুলি কণ্ঠহার,
সুবর্ণ কবচ পরে,
বীরমূর্ত্তি শোভা করে,
সম্মুখে ধরিল বালা, সখীর তাহার,
নয়নে পলক নাহি পড়ে চপলার।"

চপলা।

"একি দেবি! মনে হয় সকলি স্বপন,
এ মুখের ছায়া প্রায়
এখনো মানসে ভায়,
আহত ছিলেন সেই প্রাসাদে যখন,
হেরেছি সে অতিথিরে, করেছি যতন।
ছি ছি সখি! কি করিলে, কুল-গর্ব্ব হায়,
কি করে ভাঙ্গিলে বল,
এ যে সখি! হলাহল?
দিবে কি ভিখারী-করে জনক তোমায়,
হারাইলে আপনারে ক্ষুদ্র নারী প্রায়।"—

লাবণ্যবতী।

"কি বলিস্ চপলারে, ভিখারী এ জন?
কোন্ রাজপুত-করে
হেন অসি শোভা ধরে?
কার যশোরশ্মি আজো পরশে গগন?
হেন রূপ বীর্য্য ধরে ভিখারী কখন?
অন্ধ ও নয়ন তোর নাই কণা জ্যোতি
পূগল-নন্দন-জয়
গাহে চরাচর ময়।
শোভিতেছে পূর্ণ চাঁদ পূর্ণিমার রাতি,
মন্দোর-কুমার সে যে জোনাকীর ভাতি।"

চপলা।

"পূগল-কুমার ইনি "সাধু" নাম যাঁর,
তোমার এ রূপরাশি,
তাঁর বাহুবলে মিশি,
করিবে বিশাল বিশ্বে মহিমা প্রচার,
শিব-শক্তি ছাড়া কভু হয়েছে কি আর?
কবে সে প্রণয় হ'ল কেমন করিয়া,
আমি ত তোমার সাথে,
যাইতাম প্রতি প্রাতে,
অন্ধ চোক লক্ষ্য করি দেখিনে চাহিয়া,
আঁখির মিলনে বুঝি গেছিলে ভাসিয়া?"

লাবণ্যবতী।

"বলি সখি! মনে হয় সবি স্বপ্নপ্রায়,
এক দিন মধু-প্রাতে
তুই না আছিলি সাথে,
একেলা গেলাম আমি অতিথি-সেবায়,
দেখিনু মগন তিনি গভীর নিদ্রায়।
কি জানি কেমনে হ'ল বদ্ধ এ চরণ,
অবশ দেহের ভার,
চলিতে না পারি আর,
দাঁড়াইনু মন্ত্রমুগ্ধ সাপিনী যেমন,
মুখে শুধু চেয়ে আছি ফিরে না নয়ন।
সহসা নিদ্রার ঘোরে চমকি উঠিয়া
"লাবণ্য! লাবণ্য" করে
ডাকিলেন সকাতরে,

নিদ্রিত নয়নে অশ্রু উঠে উছলিয়া,
অমনি মেলিয়া আঁখি দেখেন চাহিয়া।
হেরিয়া সম্মুখে মোরে কে জানে কেমন
আনমনে আত্মহারা,
দেখালেন প্রাণ সারা,
আমরি প্রেমের মোহে হয়েছে মগন,
কাঙালিনী হেরিলাম সোণার স্বপন।
আমি পাগলিনী প্রায়, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে,
শুধু শুনিলাম কথা,
সে নীরব আকুলতা
বুঝালেম বুঝি সখি! সেই মুখে চেয়ে,
উভয়ের মন-কথা বুঝিনু উভয়ে।
সেই দিন হতে সখি! হৃদয় আমার,
দেবাদেব সাক্ষী করে
দেছি সে চরণ পরে,
ছুটিতেছে তাঁরি পানে প্রেম পারাবার,
মন্দোর-কুমার, কোথা স্থান বল তার?"

চপলা।

"তবে সখি! লুকাইয়া রাখিয়া কি ফল?
প্রকাশ না কর কেন
পরাণে সহিছ হেন,
গোপনে গোপনে শুধু তীব্র দাবানল,
যোগ্য পতি তাঁর সম কোথা আর বল?"

লাবণ্যবতী।

"সখিরে অদৃষ্টক্রমে বিধাতা নিদয়,
শুনি পাণি-প্রার্থী মোর
পিতা হয়ে ক্রুদ্ধ ঘোর,
উপেক্ষিত করেছেন তখনি তাঁহায়,
কুলে মানে সঁপিবেন নিজ তনয়ায়।"

চপলা।

"তবে কি উপায় সখি! নাহি কিছু আর?
তাই উপাসনা লাগি
হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
তাই মোরে লুকায়েছ কামনা তোমার?
মিলন হয় নি সখি! আর দুজনার?"

লাবণ্যবতী।

"সে দিন মিলন সখি! হয়েছে কাননে,
দেবাদেব সাক্ষী করে
আমিত বরেছি তাঁরে,
তিনি কি না করিবেন স্বধর্ম্ম পালন
রুক্মিণীর কথা সখি নাই কি স্মরণ?"
সহসা মলিন মুখ স্তব্ধ যে সে সখি,
ভবিষ্যত অন্ধকার,
হৃদয়ের চারি ধার
ঘিরিয়া তাহার যেন উঠিল চমকি,
সম্মুখে ভবিষ্য ছবি দেখিল নিরখি!

চপলা।

"যুদ্ধ করি জিনিবেন মন্দোর-কুমারে?
সখি! তাঁরো বাহুবল,
ঘোষিতেছে ধরাতল,
বিশেষ তোমার পিতা চাহেন তাঁহারে,
দুই শক্তি এক হলে জিনিতে কে পারে?"

লাবণ্যবতী।

"থাম তুই চপলারে, তোর বুদ্ধি মন,
নিরেট পাষাণ-প্রায়,
কে না জানে এ ধরায়
সে ভুজের বলরাশি কেমন ভীষণ?
সমরে শত্রুর তিনি সাক্ষাৎ শমন।
তবে নিদারুণ বিধি যদি রে আমার,
আরো তীব্র দুঃখ-সরে
যেন নিমগন করে,
তাহ'লে আছে সে শক্তি এ নারী-জীবনে,

চিরনিদ্রা যাব সুখে অনল-শয়নে।"
ছজনার মুখচ্ছবি বিষাদে কেমন
হইল মলিন-তর,
যেন প্রলয়ের পর
চিত্রাঙ্কিত হল সেই সময় ভীষণ,
আর সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তি, ভবিষ্যবচন।

এমন সময়ে আসি সখি আর জন
কহিল ত্বরিত স্বরে
"মহারাণী ত্বরা করে
ডাকিছেন তোমা দেবি। আইস, এখন,
এসেছে মন্দোর-দূত লয়ে আভরণ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নবীন ভারতী।

(৫)

আতরওয়ালার নিকট ১০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা ভরি আতর আছে। তুমি যেমন নমুনা চাহিবে, বিনা দামে আতরওয়ালা সেইরূপ আতর তোমাকে শুঁকাইয়া দিবে, তুমি আমোদে ভরপুর হইয়া যাইবে। তখন তুমি আতরের কতই প্রশংসা করিবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য আতর পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে। কিন্তু যখন মাল চাহিবে, তখন আতরওয়ালা তোমাকে উপযুক্ত দাম আনিতে বলিবে—বিনা দামে এক ছিটা ফোঁটাও দিবে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক্ এইরূপ। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর ধর্ম্মার্থীকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য নিজকৃপাগুণে এক একবার ধর্ম্মের পরমানন্দের আস্বাদন বা ঘ্রাণমাত্র দেন। ধর্ম্মার্থী অযাচিত কৃপায় বিনা পরিশ্রমে এই সুখ বা পুণ্যের অবস্থা ক্ষণেকের তরে লাভ করে এবং আনন্দে মাতোয়ারা হয়। সে কত ইচ্ছা করে, এই সুখ যেন চির দিন ভোগ করিতে পায়—এই স্বর্গের অবস্থা যেন চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু ঈশ্বর আতরওয়ালার ন্যায় চতুর ব্যবসাদার। নমুনা একটু শুঁকাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন দিবেন, কিন্তু বিনা দামে মাল এক ফোঁটাও দিবেন না। সাধককে প্রাণগত যত্ন পরিশ্রম ও ঈশ্বর-নির্ভর জপ তপস্যা বা সাধনা দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইবে—প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইবে। "বিনা দুখে হয় না সাধনা" পণ্ডিতেরা চিরদিন ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যে, যে অশ্রুপাত করিয়া বপন করে, সে আনন্দে শস্য সংগ্রহ করে। বিশ্বাস, ভক্তি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অক্লান্ত সাধনা বলে এই দুর্গম পথ সুগম হয়।

(৬)

এক সিংহের বাচ্চা দৈবক্রমে এক শৃগালের দলে পড়িয়াছিল। সে শৃগাল-

শিশুদের মাতাকে আপনার মাতা এবং শৃগালদিগকে আপনার সহোদর ভ্রাতা বলিয়া মনে করিত। তাহাদের সঙ্গে খায় দায় খেলা করে এবং তাহাদের মত ডাকিতে না পারিলেও ডাকিবার চেষ্টা করে; তাহাদের মত ভীরুতা ও ধূর্ত্ততা আয়ত্ত করিতে না পারিলেও তাহা অভ্যাস করে। এইরূপে সিংহশিশু শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। একদিন শৃগাল-ভাইদিগের সহিত সে নদী-তীরে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় সিংহ আসিয়া তথায় দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়াই শৃগাল-শিশুরা সটান দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু সিংহশিশু তত দ্রুত যাইতে না পারিয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং সিংহ ঝম্ফ দিয়া তাহাকে ধরিল। সিংহ অনেক দিনের পর হারা শিশুকে পাইয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং বলিল, "তোকে কত খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, তুই আমার সন্তান, জীবাধম শেয়ালদিগের সহিত কেন মিশিয়াছিস? তুই পশুদিগের রাজা, তোর বল বিক্রম ও সাহস দেখিয়া সকলে কম্পিত হইবে, না তুই ভয় পাইয়া ভীরুর ন্যায় শৃগালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিস! ছি ছি কি লজ্জা, কি ঘৃণার বিষয়!" সিংহ-শাবকের বিশ্বাস হয় না যে, সে শৃগাল নয়—সিংহ। পিতা তাহার হাত পা ও শরীরের গঠন শৃগাল-দিগের হইতে ভিন্ন দেখাইতে লাগিল, তাহাতেও সে বুঝে না। পরে তাহাকে ধরিয়া নদীর ধারে লইয়া গেল এবং জলে তাহার প্রতিবিম্ব ভাল করিয়া দেখিতে বলিল। সিংহ-শিশু দেখিয়া আশ্চর্য্য—শৃগালের সহিত তাহার মুখের কোনও সাদৃশ্য নাই, তাহার মুখ সেই সিংহেরি মত। সে এত দিন আপনার মুখ দেখে নাই এবং আপনাকে চিনিতে পারে নাই। এখন সে লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা চাহিল এবং তাহারি সঙ্গে থাকিয়া তাহার ন্যায় কার্য্য করিবে প্রতিজ্ঞা করিল। তখন সিংহ-শিশু পিতার সহিত মহাবনে প্রবেশ করিয়া শিকার শিক্ষা করিতে লাগিল এবং আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পশু-দিগের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিল।

এই আখ্যায়িকা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁহার প্রতি-কৃতিতে নির্ম্মিত। তাহার প্রকৃতি দেব-প্রকৃতি। সে পশুপ্রকৃতিদিগের মধ্যে পড়িয়া ভীরুতা, নীচতা, কপটতা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আপনার জীবন হীন করিয়া ফেলে এবং সংসারের অসার আমোদ প্রমোদকেই সর্ব্বোত্তম সুখ বলিয়া তাহারই অনুসরণ করে। ঈশ্বরের হস্তে মানুষ যখন ধরা পড়ে এবং দিব্যজ্ঞানে আপনার মুখ দেখিতে পায়, তখন নিকৃষ্ট সংসর্গ ও নিকৃষ্ট জীবন পরিত্যাগ করে এবং পিতার অনুগামী হইয়া আপনার উচ্চ প্রকৃতির বিকাশ লাভ করে। মনুষ্য এই দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে সমুদয় সংসারের উপর আধিপত্য স্থাপন করে এবং পিতার সহচর হইয়া অমৃতানন্দের অধিকারী হয়।

(৭)

দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ, জলের মত তরল এবং কিছুক্ষণ একভাবে থাকিলে বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন এক বস্তু আছে যাহার বর্ণ, গন্ধ ও প্রকৃতি অন্য প্রকার এবং তাহা বহু দিন থাকিলেও বিকৃত হয় না। ইহা দুগ্ধের সার পদার্থ এবং ইহার নাম ঘৃত। এই ঘৃত দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন করিতে হইলে অনেক প্রকরণ চাই এবং তাহাতে দুগ্ধজীবন কত ক্লেশ সহ্য করে ও কত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক এক সময় মনে হয়, দুগ্ধ খারাপ হইয়া নষ্টই হইল—ইহার পরিণাম আর ভাল কি হইবে?

গোয়ালা দুগ্ধকে লইয়া প্রথমে কড়ায় চড়াইয়া দিল। দুগ্ধ অগ্নির তাপে ঘন সর রূপ ধারণ করিল। সর আকারে আস্বাদে ভালই হইল এবং তাহা মনুষ্যের ভোগে লাগিলে দুগ্ধের দুগ্ধজন্ম সার্থক হয়। কিন্তু গোয়ালা তখন তাহাকে ব্যয় না করিয়া এক পাত্রে জমাইয়া রাখে। এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়, ক্রমে তাহা পচিয়া এমন বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয় যে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই উৎপাত ঘুচে মনে হয়। গোয়ালা তখন সেই পচা দুর্গন্ধ বস্তুকে যত্ন করিয়া লইয়া শীতে বাড়িতে থাকে। যখন নিশ্চিন্ত বাটী হইল, তখন একপাত্র জলে তাহাকে ফেলিয়া মন্থনদণ্ড দ্বারা সজোরে মথিতে লাগিল। দুগ্ধের যদি জীবন ও চেতনা থাকিত, সে মনে করিত যে, ঘোর পাষণ্ডের হস্তে পড়িয়া আমার কি না দুর্দ্দশা ঘটিল, এবার বুঝি প্রাণে বিনষ্ট হই! কিন্তু মন্থন করিতে করিতে তাহা হইতে দিব্য তৈলাক্ত সুকোমল শুভ্রকান্তি এক পদার্থ বাহির হইতে লাগিল। ইহার আদরের নাম মাখন বা ননী এবং কত যত্ন করিয়া ইহাকে আস্তরণপূর্ব্বক ভাল পাত্রে রাখা হইল। দুগ্ধ তখন একটু প্রফুল্ল হইল এবং ভাবিতে লাগিল যদি এই অবস্থায় থাকিতে পাই, আমার সৌভাগ্য। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা তাহা নয়। গোয়ালা তাহার জন্য জ্বলন্ত উনানে এক লোহার কড়া চড়াইল এবং এমন সুকোমল বস্তুকে ছ্যাঁক করিয়া তাহার উপরে ফেলিয়া দিল। মাখনরূপী দুগ্ধ মনে করিল এইবার প্রাণে মরিলাম!! কিন্তু কি আশ্চর্য্য যতই মাখন গলিতে লাগিল। ততই গলিত সুবর্ণের ন্যায় এক প্রকার সুন্দর পদার্থ বিনির্গত হইতে লাগিল। তাহার সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইল। গোয়ালা কটাহ হইতে অতি যত্নে সেই ঘৃতকে পাত্রস্থ করিল। এখন দুগ্ধের কি সুন্দর পরিণাম হইল! তাহার যে কিছু অসারত্ব ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে এবং দুগ্ধ খাঁটী মাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দিনে যে বিকার প্রাপ্ত হইত, এখন দুই এক বৎসর কাল নির্ব্বিকার হইয়া থাকিতে পারে এবং যত অধিক পুরাতন হইবে, তাহার বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন হইলেও গুণাধিক্য বশতঃ তাহা

মনুষ্যের তত উপকারী ও দুর্লভ বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে।

গোয়ালার হাতে দুগ্ধ যেমন সুকৌশলে ঘৃতে পরিণত হয়, অসার মনুষ্য ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলে সেইরূপ সারবান জীবন লাভ করে। তাহার জীবনের পরীক্ষা অনেক সময় ক্লেশকর ও দুঃসহ হইতে পারে; কিন্তু সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা যদি পরিচালিত হয়, তাহার সমুদায় অসারতা দূর হইয়া যাইবে এবং সে খাঁটী মানুষ হইয়া জগতের পরম হিতসাধন করিবে।

(৮)

ইক্ষুদণ্ড একখণ্ড কঠিন কাষ্ঠ, কিন্তু ইহার মধ্যে সুমিষ্ট রস রহিয়াছে। এই রস ইক্ষু মাড়িয়া বাহির করিতে হয়। রস অগ্নিতে জাল দিয়া গাঢ় করিতে পারিলে গুড় হয়, তাহা আরো সুমিষ্ট। এই গুড় যত পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়, তত দলো চিনি, কাশীর চিনি, দোবরা চিনি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহা আরো সুস্বাদু। এই চিনি আবার রস করিয়া প্রক্রিয়া বিশেষে যখন দানা বাঁধা হয়, তখন কুঁদা মিশ্রি প্রস্তুত হয়। ইহার মত স্থায়ী, সুদৃশ্য ও সুমিষ্ট বস্তু আর কি হইতে পারে? মানুষের হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব, তাহা এইরূপে মিষ্ট হইতে মিষ্টতর ও নিখাদ হইয়া ঘনীভূত ও মধুময় হয়। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

(৯)

কুম্ভকার নানা স্থান খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ভাল মাটী বাছিয়া মাথায় করিয়া বহিয়া আনে। মৃত্তিকার তখন আত্মগৌরবে কত আনন্দ! কিন্তু হায়! পর দিন কুমার সেই মাটিকে জলসিক্ত করিয়া পদদ্বারা দলন করে। তখন মাটীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়। সেই অহঙ্কার যেন আরো চূর্ণ করিবার জন্য কুম্ভকার মাটীকে মুদ্গর দ্বারা আঘাত ও পেষণ করে। মাটীর দুঃখ মাটীই জানে, তাহার ফুটিয়া এক কথা বলিবার শক্তি নাই। তাহার প্রভু পরে সেই মাটী তাল পাকাইয়া চক্রে স্থাপন করে এবং সেই চক্র ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহাকে কাটিয়া ছিটিয়া একটী ঘট প্রস্তুত করে। মাটী আপনার দুর্দ্দশা সব দেখিতেছে এবং সহিয়া যাইতেছে। কুম্ভকার তৎপরে সেই ঘটকে দিনের পর দিন রৌদ্রতাপে শুখাইতে থাকে। যখন ঘট খুব শুষ্ক হয়, তখন পোনে আগুন জ্বালিয়া তন্মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করে এবং দগ্ধ করিয়া পাকা ঘট হইলে তাহা বিক্রয় করে। এই ঘট পূজার্থ গৃহস্থ কিনিয়া লইয়া গিয়া পুরোহিত দ্বারা আপন গৃহে ঘট স্থাপন করে। পুরোহিত ঘটটী পবিত্র গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া ফুল ও বিল্বদল দিয়া যখন মন্ত্রপূত করেন, তখন সেই ঘটে ইষ্ট দেবতার আবির্ভাব হয় এবং গৃহস্থ আত্মীয় পরিজন ও অপর সাধারণকে লইয়া তাহার নিকটে দণ্ডবৎ প্রণত হন। মৃত্তিকার ঘটের মধ্যে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রাণরূপেণ সংস্থিতা"—যে দেবী সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার সাক্ষাৎ

অধিষ্ঠান, ইহার অপেক্ষা ঘটের গৌরব ও সৌভাগ্য কি হইতে পারে? তাহার ঘট-জন্ম এত দিনে সার্থক হইল। যে মৃত্তিকার ঘট চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির আবাস হইয়াছে, তাহার যদি চেতনাশক্তি থাকিত, সে পদ-দলন, মুদ্গরতাড়ন, চক্র-নিষ্পেষণ এবং রৌদ্র ও অগ্নিতাপ-দহন—আত্মজীবনের অতীত সকল কষ্ট ভুলিয়া পৃথিবীর বস্তু স্বর্গের বস্তু হইয়াছে ভাবিয়া আনন্দে বিহ্বল হইত এবং প্রাণময়ী দেবতাকে প্রাণে ধরিয়া জীবন ও জন্ম ধন্য মানিত।

ঈশ্বর ধর্ম্মসাধনার্থ মানুষকে যখন আহ্বান করেন, তখন তাহাকে আদরে মাথায় করিয়া আনেন। কিন্তু পরে তাহাকে তাঁহার পূজার উপযুক্ত করিবার জন্য নানা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। সে পদদ্বারা দলিত হয়, নানা প্রকার তাড়না লাঞ্ছনা ভোগ করে এবং ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হয়। এই সকলের মধ্যে ঈশ্বর তাহার হৃদয় ঘটকে প্রস্তুত করেন। পরে সেই ঘট যখন পবিত্র ভক্তি গঙ্গাজলে পূর্ণ হয় এবং তাহাতে প্রাণের দেবতার আবির্ভাব হয়, তখন সাধক সকল কষ্ট দুঃখ ভুলিয়া যান এবং আনন্দময়কে হৃদয়ে লইয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। তখন তাঁহার জীবন কৃতার্থ হয়।

শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সন্তান পালন ও সন্তানদিগের শিক্ষা বিধান বিষয়ে শিক্ষিতা মহিলাদিগের দায়িত্ব কি গুরুতর। আমরা যে সকল কারণে রমণীদিগের উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, তন্মধ্যে সন্তানপালন ও সন্তানদিগের সুশিক্ষা বিধান প্রধান কারণ। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে সচ্চরিত্রা ও গুণবতী মাতার পুত্র কন্যাগণই গুণবান্ এবং গুণবতী হইয়া থাকে। জননী যে কেবল স্তন্যদানে ও অন্নদানে সন্তানের শরীরই গঠন করিয়া থাকেন, তাহা নহে। সন্তান স্তন্যরসের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃহৃদয়ের পুণ্য-রসও আকর্ষণ করিয়া থাকে। সন্তান জননীর চলা-ফেরা কথা-বার্ত্তা ও হাব ভাবের অনুকরণ করিয়া যেমন চলিতে শিখে, বলিতে শিখে, তেমনি জননীর প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে, প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারে অন্তরের যে সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সন্তান তাহারও অনুকরণ করে; সেই সকল ভাবের দ্বারাই তাহার বাল্যজীবন সংগঠিত হয়।

এই জন্য জননীদিগের চরিত্র যে কতটা উন্নত হওয়া আবশ্যক, তাহা প্রত্যেক

পুরুষ ও নারীরই স্মরণ রাখা বিধেয়। আমরা দেখিতে পাই, জগতের উন্নত-চরিত্র সাধুপুরুষদিগের জননীগণ প্রায় সকলেই ধর্ম্মশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহারা শৈশবকালে সন্তানদিগের কোমল অন্তঃকরণে এমন এক সুশিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন যে, সেই বীজ হইতেই তাঁহাদের হৃদয়ে সাধুতা ও সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং নারীহৃদয় যেমন পুণ্যে সু-নির্ম্মল, স্নেহ মমতায় সুকোমল হওয়া প্রয়োজন, তেমনি উচ্চশিক্ষাতেও উন্নত হওয়া আবশ্যক।

রমণীগণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা না হইলে সন্তানদিগের সঙ্গে কখন কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সন্তানদিগের সাক্ষাতে কিরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে, তাহাদিগের সম্মুখে কখন কিরূপ আদর্শ ধরিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষার জন্য, সুখের জন্য, আমোদের জন্য, আদর ও শাসনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; —এই সকল গুরুতর বিষয়ে কিরূপে জ্ঞান লাভ করিবেন?

তাঁহারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে পারিলেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শিশুপ্রকৃতির অস্ফুট ভাবগুলি বুঝিতে পারিবেন, এবং সেই সকল অস্ফুট ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে, যেরূপ শিক্ষা ও অন্যান্য আয়োজনের প্রয়োজন, তাহাও করিতে পারিবেন।

অতএব এ কথা এক প্রকার নিশ্চয় যে, এ দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের উপরেই নির্ভর করে।

এ দেশের অশিক্ষিতা রমণীগণ, তাহাদিগের নির্ম্মলহৃদয়ের সুকুমার স্নেহধারায় সন্তানদিগকে যতটা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, হয় ত অন্য কোন দেশের রমণীরাই তাহা পারেন না; অথবা সন্তানদিগের সেবায় এদেশে মাতারা আপনাদের সুখ দুঃখ যেরূপ অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, আমরা জানি না অন্য কোন দেশের জননীরা তাহা পারিয়া উঠেন কি না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বলিতে হইবে, এতদ্দেশীয় রমণীগণ সন্তানদিগকে উপযুক্ত সুশিক্ষা দানে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

এইজন্য দেখা যায়, এ দেশের যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও লাভ করিতেছেন, অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্রদিগকেও সুখী করিতেছেন; কিন্তু চরিত্রগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া জনক জননীর মুখোজ্জ্বল করিতে, অথবা স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিতে ও যশস্বী হইতে কয়জনকে দেখা যায়?

অতিপূর্ব্বে যখন হিন্দু জাতির সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হয় নাই, যখন প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির ন্যায় পুণ্য ও প্রীতিতে হিন্দুর নির্ম্মলচিত্ত সুশোভিত থাকিত, যখন মধ্যাহ্ন ভাস্করের দীপ্ত তেজোরাশির ন্যায় বীরত্বে ও মহত্ত্বে হিন্দু-হৃদয় সমুজ্জ্বল থাকিত, তখন হয় ত হিন্দু নারীগণের

পবিত্র চিত্ত উচ্চশিক্ষায় উন্নত না হইয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু তখন বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ও সামাজিক সংঘর্ষণে সমাজে নানা প্রকার বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত হয় নাই, দেশের রীতি নীতিও দূষিত হইয়া যায় নাই, সমাজমধ্যে নাস্তিকতা, কপটতা এবং ধর্ম্মবিহীন শিক্ষারও প্রাবল্য উপস্থিত হয় নাই। তখন ভোগৈশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ আসক্তিশূন্য শুভচিত্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী গুরুদিগের গৃহেই সন্তানদিগকে রাখিয়া দেওয়া হইত। সন্তানগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যায় বিদ্যাবান্, সংযমে সংযমী ও ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইয়া জনক জননীর নিকট ফিরিয়া আসিতেন। কাজেই তখন রমণীগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও সন্তানদিগের শিক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাত হইত না।

কিন্তু এখন আর সে কালও নাই, সে সমাজও নাই, সেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলন করাও অসম্ভব। তাহার পর কিছুকাল পূর্ব্বে (ইদানীন্তন কালেও) বাড়ীর বৃদ্ধ দাদা মহাশয়েরা পৌত্র দৌহিত্রদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের অন্য কোন কার্য্যই ছিল না, সর্ব্বদা নাতি নাতিনীদিগকে লইয়া হাসি গল্প আমোদ প্রমোদ করিতেন, চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক কাহিনী বর্ণন করিয়া নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, এবং শুভঙ্করী ও উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বচন সকল মুখে মুখে শিখাইয়া দিতেন।

এখন সে দাদা মহাশয়দিগের সঙ্গেও নাতি নাতিনীদিগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। দাদা মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, অর্থশালী, অথবা মোটা পেন্সিয়ান-ভোগী; তাঁহারা প্রায় সকলেই বৃদ্ধ বয়সটা হয় দার্জ্জিলিঙ্গে নয় ত মধুপুর, গিরীডী, কিম্বা বৈদ্যনাথেই কাটাইয়া দেন। প্রতিদিন "বেঙ্গলী" "অমৃতবাজার" পাঠ, নিদ্রা, আহার, ভ্রমণ ও গল্পগুজবই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য হইয়া উঠে। আর যাঁহাদের তেমন অর্থ নাই, তাঁহারা পৈতৃক বসতবাটীতে বাস করিয়া নাতি নাতিনীর পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়ার সঙ্গেই প্রণয় সংস্থাপন করেন, এবং আস্তে আস্তে বৈতরণী নদীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। আর তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানেরা পরিবার পরিজন লইয়া দূর বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করেন।

কাজেই এখন আর আমাদের বালক বালিকারা যে দাদা মহাশয়ের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও সাহায্য পাইবে, তাহার আশা নাই।* অথচ বালক বালিকাদিগের যাঁহারা পিতা,—প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের জীবন-সংগ্রাম এরূপ কঠোর যে, সন্তানদিগের সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তাঁহারা একেবারে অসমর্থ।

কেমন করিয়া দৃষ্টি রাখিবেন? তাঁহাদের

* দাদা মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন দিদীমারাও ছেলে মেয়েদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা এবং মানসিক উন্নতির অনেক সহায়তা করিতেন, এখন তাহারও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বা, বো, স।

সময় কোথায়? কেহ হয় ত উকিল। প্রত্যূষে উঠিলেন। মুখ ধুইয়া চা-পান করিলেন। একটু মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলেন। তার পর যেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, অমনি ভ্রুকুটি-কুটিল ফন্দীবাজ সেয়ানা মক্কেলেরা বগলে এক তাড়া কাগজ লইয়া, এবং মনে অনেক রকম ফেরব্বাজি বুদ্ধি লইয়া হাজির হইল; অতি অল্প প্রয়োজনীয় কথার সঙ্গে বিস্তর অপ্রয়োজনীয় কথা বলিয়া উকীল মহাশয়ের ঘড়িতে দশটা বাজাইয়া দিল।

উকীল বাবু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া চোগা চাপকান পরিয়া শামলা মাথায় দিয়া কাছারিতে চলিলেন। বেলা দশটা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত জেরাতে, বক্তৃতাতে, আইনের নজীরেতে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য অথবা সত্যকে সত্যই সপ্রমাণ করিয়া অপরাধী রামকে খালাস করিয়া, নির্দ্দোষী শ্যামকে জেলে পাঠাইয়া,কিম্বা প্রকৃত দোষী ব্যক্তিরই দোষ সাব্যস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে একটু জলযোগ করিলেন। একটু সমবয়স্কদিগের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া লইলেন। আবার যেমনই সন্ধ্যা অতীত হইল, অন্ধকারে ধরণীর মুখ আচ্ছন্ন হইল, অমনি একটি দুইটি করিয়া মক্কেলের দল আসিয়া উকীল বাবুর বৈঠকখানার বেঞ্চগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এইরূপ মুনসেফ বাবু বল, ডেপুটী বাবু বল, ডাক্তার বাবু বল, ইঞ্জিনিয়ার বাবু বল, সকল বাবুরই এক দশা। আপীসে গাধা খাটুনি খাটিতে হয়, বাসায় আসিয়াও রায় লিখিতে হয়, আইন পড়িতে হয়, বাহিরের কাজের চিন্তা করিতে হয়। কেরাণীরা ত আপীশের সাহেবদের কাছে মাথা বিক্রয় করিয়াছে। এক বা অবসর আছে একটু স্কুল-মাষ্টারদের। তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহাদের অধিক বেতন, সেই সকল ব্যক্তিরই চাকুরীতে পোষায়। নহিলে অল্প বেতনের মাষ্টারদের লোকের বাড়ী বাড়ী ছেলে পড়াইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে হয়।

এখন সকলে একবার চিন্তা করুন, এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তি কখনই বা আত্মোন্নতি করিবেন,কখনই বা একটু ধর্ম্মকর্ম্মের চেষ্টা করিবেন, কখনই বা সন্তানদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিবেন?

কিন্তু বামন ঠাকুরাণী ও ঝিদিগের আবির্ভাবে ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত রমণীদিগের সময়ের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। বরং রাশি রাশি বাঙ্গালা গল্পের বহি ও খবরের কাগজের চুট্‌কি প্রবন্ধই অল্পশিক্ষিতা মেয়েদের সময় কাটাইবার একটা উপায় হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় মেয়েরা যদি উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হন, এবং সেই সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি পাশ্চাত্য রমণীদিগের অসংযত বিলাস-বুদ্ধি জাগ্রত না হইয়া তাঁহাদিগের উন্নত কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা সন্তানদিগের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

অনেকে হয়ত বলিবেন, কেন? আমরা ত ছেলে মেয়েদের জন্ত টাকা খরচ করিয়া বাড়ীতে এক একজন মাষ্টারেরই বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহারাই ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তত্বাবধান করিয়া থাকে।

আমরা জানি, অনেকেই এই দু ঘণ্টার ভাড়াটে শিক্ষকের হস্তে সন্তানদিগের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তাহার ফল কি বড় ভাল হইতেছে না কি? মফঃস্বলের অনেক দরিদ্র ছাত্র, যাহারা অর্থাভাববশতঃ পড়াশুনায় কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে পারে না, অথবা যাঁহাদের চাকুরীর যৎসামান্ত আয়ের দ্বারা উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাঁহারাই দুর্ভাগা জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তগুলি দশ জায়গায় বিক্রয় করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ছেলে পড়াইয়া বেড়ান।

এই সকল শিক্ষক সকালে উঠিয়াই হয়ত এক বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সে বাড়ীর আদুরে ছেলেগুলির ঘুমই আর ভাঙ্গে না। শিক্ষক বেচারী উদ্বিগ্ন হইয়া ভৃত্যকে চারি পাঁচ বার বাটীর ভিতর পাঠাইলেন। তারপর চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ছেলে বাবুরা আসিয়া দর্শন দিলেন। কিন্তু রাত্রে শোবার সময় কার বই কে যে কোথায় রাখিয়া দিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। তাহা লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে কতক্ষণ কলহ চলিল। অবশেষে দুই তিন জায়গা খুঁজিয়া বইগুলি পাওয়া গেল এবং পড়া আরম্ভ হইল। বইগুলির ভাল করিয়া পড়া হইতে না হইতেই মাষ্টার বাবু ঘড়ি খুলিলেন। দেখিলেন, তাঁহার স্কুলে বা আপীসে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। কাজেই তিনি কোন রকমে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া বাসায় চলিলেন। তাড়াতাড়ি স্নান আহার করিয়া আপীসে ছুটিলেন। আবার তিনিই হয়ত সন্ধ্যা-সমাগমে ক্ষুধাক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে অন্য এক বাড়ী ছেলে পড়াইতে যাইবেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মুখ হয়ত একটি বাক্যও উচ্চারণ করিতে চাহিবে না। তথাপি মাষ্টার বাবু কোন রকমে আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া মাসের শেষে দশটী টাকা পকেটস্থ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিবেন।

এখন জিজ্ঞাসা করি, যাহাঁরা পেটের দায়ে আপনার শরীর ও মনের উপর নিতান্ত জুলুম করিয়া বাড়ী বাড়ী ছেলে পড়াইতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগের হস্তে সন্তানদের ভারার্পণ করিয়া জনক জননীদিগের কি নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত? ঐ সকল শিক্ষকদিগের চরিত্র ভাল না মন্দ, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করাও অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে।

দুঘণ্টার জন্ত নিযুক্ত মাষ্টারের হাতে ছেলেদের ভার দিলে, ঘরে যে রকম শিক্ষা হয়, তাহা ত এক রকম বর্ণনা করা গেল। তদ্ভিন্ন ছেলেরা যে স্কুল কলেজে পড়ে, সেখানে অধিকাংশস্থলে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সুবন্দোবস্ত নাই, ছাত্রদিগের উপর মাষ্টার-

দিগের চরিত্রেরও কোন প্রভাব নাই; ছেলেরা যে সকল ছাত্রদিগের সংসর্গে মিলিত হয়, তাহাদিগের নৈতিক অবস্থা উন্নত নহে।

এরূপ অবস্থায় সুশিক্ষিতা রমণীগণ যদি সন্তানদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান না করেন, চরিত্রের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তাহাদের আচার ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক না হন, তাহা হইলে আর কেই বা দৃষ্টি রাখিবে, কেই বা সতর্ক হইবে? ছেলেরা আপন খেয়ালে চলিয়া চলিয়া স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

আমরা সেই জন্যই বলিতেছি, শিক্ষিতা মহিলাগণের সন্তানদিগের সুশিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতিসাধন বিষয়ে দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। তাঁহারা যদি উচ্চশিক্ষা পাইয়াও সন্তানদিগের সমস্ত ভার ভাড়াটে শিক্ষক-দিগের হস্তে অর্পণ করেন, এবং নিজেরা ইংরাজী বাঙ্গালা গল্পের বহি পাঠ করিয়া আমোদে প্রমোদে সময় কাটাইয়া দেন; অথবা যদি বালকবালিকাদিগকে কেবল উত্তম উত্তম আহার্য্য সামগ্রী দান করিয়া, মনোরম মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সুশোভিত করিয়া, শুধুই ভোগসুখে অভ্যস্ত করেন, শুধুই বি, এ পাশ করিবার জন্য, শুধুই বিবাহের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলেন; তাহা হইলে এদেশের ছেলেদের আর মানুষের মত মানুষ হইবার আশা কোথায়?

তাই বলি, শিক্ষিতা মহিলারা যদি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তান-দিগের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করেন, শিক্ষায় ও সৎকার্য্যে সন্তানদিগকে উৎসাহিত করেন, সন্তান-দিগের সঙ্গে গল্প গুজব গান বাজনা আমোদ-প্রমোদ করিয়া তাহাদিগের বন্ধু-স্থানীয় হইতে পারেন, তাহাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন; এবং মহৎ লোকের জীবনের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া ও স্বীয় স্বীয় জীবনের উন্নত আদর্শ দেখাইয়া, সন্তানদিগের ভিতর কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রস্ফুটিত করিতে পারেন, জ্ঞানানুরাগ বর্দ্ধিত করিতে পারেন, পরসেবার ভাব জাগাইয়া দিতে পারেন, ধর্ম্মভাবে তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা ধন্য।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ঈশ্বরের নামাবলী।

স্খলনহীন, স্তন্যদাতা, স্তন্যরক্ষক, স্তব্ধ, স্তবনীয়, স্তিমিতলোচনধ্যেয়, স্তুত, স্তুতি-বাদাতীত, স্তূয়মান, স্ত্রীজাতিবন্ধু, স্ত্রীরূপিণী, স্ত্রীপুংপ্রভু, স্থ, স্থপতি, স্থলজলদেবতা, স্থবির, স্থাপয়িতা, স্থায়ী, স্থাণু, স্থির, স্থিরতর, স্থিরতম, স্থিরসিদ্ধান্ত, স্থূলত্বহীন, স্থেয়, স্থৈর্য্যবান্, স্নিগ্ধ, স্নেহদাতা, স্নেহ-বান্, স্নেহময়, স্নেহার্ণব, স্পর্দ্ধাহারী, স্পর্শ-মণি, স্পৃহণীয়, স্ফুরিত, স্ফূর্ত্তিমান্, স্মরগুরু, স্মরণীয়, স্মরহর, স্মর্ত্তব্য, স্রষ্টা, স্বকীয়,

স্বচ্ছন্দ, স্বতঃ, স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বতন্ত্র, স্বতঃসিদ্ধ, স্বত্ববান্, স্বপ্রকাশ, স্ববশ, স্বভূ, স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভুব, স্বরাট্, স্বরূপ, স্বর্গ, স্বর্গপতি, স্বর্গ-বিধাতা, স্ববীজ, স্বস্তি, স্বস্তিবাচক, স্বস্থ, স্ব-স্বরূপ, স্বাত্ম, স্বাধীন, স্বাভাবিক, স্বাভাবিকজ্ঞানশক্তি, স্বামী, স্বামীর স্বামী।

হ।

হংস, হননকর্ত্তা, হতাশের আশা, হর্ত্তা, হস্তবান্, হস্তবিহীন, হসন, হর, হরি, হরিকেশ, হরিদেব, হরিমঙ্গল, হরিসুন্দর, হর্ত্তা, হর্ষণ, হর্ষমান, হানিপূরক, হার, হারক, হারাধন, হারী, হিংসাহীন, হিতকাম, হিতকারী, হিতসাধক, হিতৈষী, হিরণ্ময়, হীনতারণ, হৃদয়রতন, হৃদয়বন্ধু, হৃদয়বান্, হৃদয়ের ধন, হৃদয়রঞ্জন, হৃদয়রতন, হৃদয়শোভন, হৃদয়েশ, হৃদয়েশ্বর, হৃদিবল্লভ, হৃদীশ, হৃষ্ট, হৃষীকেশ, হ্রীমান্, হ্লাদী।

রসায়ন-তত্ত্ব।

কার্ব্বণ।

কয়লা।

চিহ্ন C ; সাংযোগিক গুরুত্ব ১২।

অবস্থা—অসংযুক্ত অঙ্গার কঠিন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংযুক্ত অবস্থায় চৌর্ণোপল (যে প্রস্তর হইতে চূণ জন্মে), চা খড়ি, মার্ব্বেল, প্রবাল ও শম্বুকাদিতে যথেষ্ট আছে। ইহা জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরের এক প্রধান উপকরণ। ইহাকে অম্লজনের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়।

কার্ব্বণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক অঙ্গার আবার হীরা, কৃষ্ণসীস (Graphites), ও পাথুরিয়া কয়লা বা কোল্ ভেদে তিন প্রকার। কৃত্রিম অঙ্গারও তিন প্রকার, যথা—কয়লা বা সামান্য অঙ্গার, অস্থ্যঙ্গার ও দীপাঙ্গার। কয়লা, হীরা ও গ্রাফাইট্, এই তিন পদার্থ অঙ্গারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; অর্থাৎ কয়লা, হীরা ও কৃষ্ণসীসের বর্ণ, কাঠিন্য ও ভার প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণ সকল পৃথক্ পৃথক্ হইলেও ইহারা অঙ্গার-নামক একটী ভূত বা মূল পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কয়লা, হীরা ও কৃষ্ণসীস লইয়া বায়ুমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহাদিগের প্রত্যেক পদার্থ হইতে সমান সমান পরিমিত অঙ্গার অম্লজনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সামান্য সামান্য দ্ব্যম্লাঙ্গার গ্যাস উৎপন্ন হয়।

হীরা—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ। রত্নশ্রেষ্ঠ হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গার বই আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত গোল্‌কুণ্ডা, সম্বলপুর ও বুন্দেলখণ্ডে, এবং বর্ণিয়ো দ্বীপে, ইউরাল পর্ব্বত সন্নিধানে ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে পান্না রাজ্যে হীরকের খনি আছে। ভারতবর্ষের খনি সমূহে এখন আর সেরূপ হীরক প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। অধুনা ব্রেজিলদেশীয় খনিসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। স্ফটিকভাবাপন্ন হইবার সময় হীরক ঘনসম ত্রিভুজ, ঘনসম চতুর্ভুজ, ঘনসম অষ্টভুজ প্রভৃতি মনমেট্রিক বা একবিধ-মূর্ত্তি প্রণালীর কোন না কোন আকার ধারণ করে। হীরার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫৫। বিশুদ্ধ হীরক বর্ণহীন স্বচ্ছ পদার্থ। কিন্তু পীত, লোহিত, হরিৎ, শ্বেত, নীল, এমন কি কৃষ্ণবর্ণের হীরকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ হীরকের প্রভা অতি চমৎকার, এই জন্য হীরা বহুমূল্য হইয়াছে; এবং ইহা অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। ইহা কাচ কর্ত্তন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। হীরককে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন-পূর্ণ বোতল মধ্যে নিমগ্ন করিলে অতি সুন্দর তেজ ও জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, এবং অক্সিজেনের সহিত হীরকের সংযোগে CO_2 (আঙ্গারিকায় বায়ু) উৎপন্ন হয়, হীরকের কোনও চিহ্ন থাকে না। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গার বই আর কিছুই নহে। ইহা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায় না। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে ইহা সর্ব্বপ্রথম নশ্বর পদার্থ বলিয়া সপ্রমাণ হয়।

গ্রাফাইট বা কৃষ্ণসীস—ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ সীসের ন্যায়, এ নিমিত্ত ইহাকে কৃষ্ণসীস কহে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা সীস নহে। সিংহল দ্বীপে, সাইবিরিয়া দেশে, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কম্বারলণ্ড প্রদেশে, আমেরিকাতে, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে ইহার আকর আছে। প্রথমতঃ মহারাণী এলিজেবেথের রাজত্বকালে ইহা কম্বারলণ্ডের অন্তঃপাতী বরোডেল নগর হইতে আনীত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·২০৯। ইহা কাগজের উপর ঘষিলে ধূসরবর্ণ দাগ পড়ে; এই জন্য ইহা দ্বারা পেন্সিল প্রস্তুত করে। ইহা অতিশয় কোমল ও স্নৈহিক; এই নিমিত্ত ইহাকে চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ নিবারণ জন্য গাড়ীর চাকার আলে দিয়া থাকে। ইহা অতিশয় দুর্দাহ্য, এই নিমিত্ত ইহার মুচি প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণকারেরা স্বর্ণাদি ধাতু দ্রব করে। বায়ুমধ্যে রাখিয়া দিলে ইহাতে মরিচা পড়ে না, এই নিমিত্ত লৌহাদি যে সকল ধাতু বায়ুমধ্যে রাখিলে মরিচাযুক্ত হয়, সেই সমস্ত ধাতুর উপর কৃষ্ণসীসের প্রলেপ দেওয়া হয়। গন্ধক-দ্রাবক ও পটাসিয়ম ক্লোরেট সহযোগে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণসীস প্রবলরূপে তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণসীস সূক্ষ্ম গুঁড়ার আকারে পৃথক্ হইয়া আসে। লৌহ-নির্ম্মিত সামগ্রীর উপর কৃষ্ণসীস দিয়া তাহার মসৃণতা সম্পাদন করা যায়। ইহার বিশেষ গঠন নাই; কখন কখন ষট্‌কোণবিশিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। হীরা যেমন সহজে বাষ্পে দগ্ধ হয়, গ্রাফাইট তদ্রূপ হয় না। কৃষ্ণসীস সহজে চূর্ণ করা যায়।

পাথুরিয়া কয়লা বা কোল—অঙ্গার ব্যতীত ইহাতে অম্লজান, উদজান ও যবক্ষারজান মিশ্রিত আছে। পাথুরিয়া

কয়লা খনিজ পদার্থ। উত্তর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পৃথিবীর অনেক স্থানে উহার আকর দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত রাণীগঞ্জ গিরিদি প্রভৃতির খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। খনিতে নামিবার সময় চতুর্দ্দিকস্থ কয়লার উপর উদ্ভিদ সকলের পত্রাদি অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদায় দেখিয়া বোধ হয় যে, পাথুরিয়া কয়লা উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথ্বীতলস্থ উদ্ভিদরাশি কালচক্রে ভূগর্ভশায়ী হইয়া কোলরূপে পরিণত হয়। যে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভাবে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া কয়লা হয়, তাদৃশ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ভূগর্ভশায়ী উদ্ভিদও কয়লারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যেমন কাষ্ঠদাহে তাহার সমুদায় উদজান ও অম্লজান বহির্গত হয়, ভূগর্ভ-পরিণত কোল সেরূপ সর্ব্বতোভাবে উদজান ও অম্লজানশূন্য হয় না। অধিকন্তু উহাতে এক প্রকার তৈলিক পদার্থ লক্ষিত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩২ হইতে ১·৭২ পর্য্যন্ত।

কোল তিন প্রকার যথা—এ্যানথ্রাসাইট, পিট ও লিগ্নাইট কোল।

১। এ্যানথ্রাসাইট—ইহা শীঘ্র দগ্ধ হয় না। যখন দগ্ধ হয়, তখন শিখার সহিত প্রজ্বলিত হয় না। ইহাতে শতকরা ৯৩ অংশ বিশুদ্ধ কার্ব্বণ আছে। ষ্টীম এঞ্জিন চালাইবার সময় এই কয়লা ব্যবহৃত হয়।

২। পীট্—ইহা দ্বারা রন্ধন ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাতে একটি বায়ব বাষ্প আছে। ইহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহার কতকগুলি টুকরা অগ্নিতে তাতাইলে তাহারা গলিত হইয়া চাপ বাঁধে। ইহাতে শতকরা ৮৪ ভাগ বিশুদ্ধ কার্ব্বণ আছে।

৩। লিগ্নাইট কোল—গ্যাস প্রস্তুত কারখানায় এই কোল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শতকরা প্রায় ৭০ অংশ কার্ব্বণ আছে। কোল দুই দ্রব্য ধারণ করে (ক) অরগ্যানিক ম্যাটার, যাহা দাহনের দ্বারা পৃথক্ করা যায় এবং (খ) ইন্-অরগ্যানিক ম্যাটার, যাহা দাহনের পর ভস্ম অবস্থায় পতিত থাকে।

কয়লার অর্গ্যানিক পদার্থে অধিক কার্ব্বণ এবং হাইড্রজেন ও অল্প নাইট্রজেন আছে। ইন-অর্গ্যানিক পদার্থে কেবল বালি, কাদা, গন্ধক ও লোহা থাকে। জ্বালানি কার্য্যে পাথুরিয়া কয়লার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। কলিকাতায় যে গ্যাসের আলোক প্রদত্ত হয়, তাহা এই পাথুরিয়া কয়লা হইতে উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন পাথুরিয়া কয়লা হইতে মভ, ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি রঙ্, এবং এমোনিয়া, আলকাতরা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

কোক্—কোল হইতে আলকাতরা, জল, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থ বহির্গত হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় বিশুদ্ধ অঙ্গার, উহাকে কোক্ বলে।

অধুনা কোক্ ইন্ধনস্বরূপে ব্যবহার হইতেছে। কোক্ ধূসরবর্ণ, সচ্ছিদ্র ও অত্যন্ত কঠিন, এবং ধাতুর ন্যায় ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট। কোক্ পোড়াইলে ঝুল কালী পড়ে না এবং প্রখর তাপ পাওয়া যায়। লৌহাদি ধাতু গলাইবার জন্য কোক্ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রস্তুত করে।

কয়লা বা সামান্য অঙ্গার—উদ্ভিদ দগ্ধ করিলে যে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, তাহাকে কয়লা বলে। আধ সের কাট পোড়াইলে প্রায় আধ পোয়া কয়লা হয়। বায়ু-প্রবাহে কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে তাহার অধিকাংশ উড়িয়া যায়। এই হেতু প্রবাহ-শূন্য বায়ুমধ্যে কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া কয়লা প্রস্তুত করে। যদি একখান জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার কিয়ৎভাগ কোনও পরীক্ষা নল মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রবিষ্ট ভাগ কয়লা মাত্রে পরিণত হয়; বহির্ভাগ শিখা-বিশিষ্ট হইয়া জ্বলিয়া যায়। কাষ্ঠদাহন-কালে তদন্তর্গত উদ্‌জান ও অম্লজান সংযোগে যে সকল উদ্বেল পদার্থ জন্মে, তৎসমুদায় উড়িয়া যায়। অঙ্গার ধাতব পদার্থের সহিত কয়লারূপে অবস্থান করে। কয়লা ছিদ্রবহুল পদার্থ, উহার মধ্যে বায়ু ও জল শোষিত থাকিতে পারে। এক খানি টাট্‌কা কয়লা লইয়া কোন আর্দ্র-স্থানে এক দিন রাখিয়া দিলে, তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইয়া ভার বৃদ্ধি হয়। কয়লা আপন আয়তন অপেক্ষা ৯০ গুণ এমোনিয়া ও ৯ গুণ অক্সিজেন শোষিত রাখিতে পারে। এই শোষকতা শক্তি থাকাতে কয়লা দ্বারা জল ও বায়ু শোষিত হইয়া থাকে। এক ইঞ্চ পরিমিত কয়লা-গুঁড়ার নীচে একটী মৃত ইন্দুর রাখিয়া দিলে উহা পচিয়া যায় বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধন কোনও দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। কয়লা দ্বারা ঐ দুর্গন্ধ শোষিত ও নিবারিত হয়। রোগীর গৃহে কয়লার ঝুড়ি টাঙ্গাইয়া তথাকার বায়ুর দোষ সংশোধন করা গিয়া থাকে। কয়লা মধ্য দিয়া নিস্রুত করিয়া লইলে মলিন জল পরিষ্কৃত হয়। কাষ্ঠাঙ্গারের ছিদ্রসমূহ বাষ্পে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া উহা জলের উপর ভাসে। ইহাতে সামান্যত বোধ হইতে পারে যে, অঙ্গার জল অপেক্ষা লঘু, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অঙ্গার গুঁড়া করিলে উহার মধ্যস্থ ছিদ্রগুলি বিনষ্ট হয়। তজ্জন্য অঙ্গারচূর্ণ জলের উপর নিক্ষেপ করিলে উহা না ভাসিয়া আস্তে আস্তে জলে নিমগ্ন হইতে থাকে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, কাষ্ঠাঙ্গার জল অপেক্ষা ভারী।

অস্থ্যঙ্গার—কোনও অবরুদ্ধ পাত্রে অস্থি রাখিয়া তাপ দিলে যে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, তাহাকে অস্থ্যঙ্গার কহে। অস্থ্যঙ্গারের দশাংশের একাংশ বিশুদ্ধ অঙ্গার, অবশিষ্ট নয় অংশ ভস্ম। অস্থ্যঙ্গারের বর্ণনাশকতা শক্তি অতিশয় প্রবল। বার্লি শর্করাদি পরিষ্করণার্থ ইউরোপীয়েরা বহুল পরিমাণে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ঔদ্ভিদিক বর্ণ নষ্ট করে।

দীপাঙ্গার—প্রবাহশূন্য বায়ুমধ্যে দীপ জ্বালাইয়া এই অঙ্গার সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা দ্বারা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মসী প্রস্তুত হয়। ছাপিবার জন্য যে মসী ব্যবহৃত হয়, তাহা দীপাঙ্গার হইতে তৈয়ার হয়। রজন, তার্পিণ তৈল প্রভৃতি যে সকল পদার্থে অধিক অঙ্গার আছে, সেই সকল দ্রব্য প্রজ্বলিত করিয়া কোন পাত্র দ্বারা আবৃত করিলে পাত্রের গায়ে কৃষ্ণবর্ণ দীপাঙ্গার লাগিয়া যায়।

ঝুল (সুট)—কাষ্ঠাদি পোড়াইবার সময় কিয়দংশ অঙ্গার ধূমাকারে দেওয়ালের গায়ে বা ছাদে লাগিয়া তথায় কৃষ্ণবর্ণ আবরণের ন্যায় সঞ্চিত হয়, ইহাকে ঝুল বা সুট কহে। কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার সময় উহা হইতে যে এমোনিয়া বাষ্প নির্গত হয়, তাহা এই ঝুলের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া ঝুল কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম্ম—কার্ব্বণ কঠিন পদার্থ, আস্বাদ-হীন ও গন্ধ-বিরহিত; প্রায় সচরাচর ইহা কৃষ্ণবর্ণ; অতি সহজে ইহাকে গুঁড়া করা যায়; সকল তরল পদার্থে ইহা অদ্রব। গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারির প্রবল স্রোত দ্বারা ইহাকে কোমল করিতে পারা যায়। ইহা উত্তাপের পর উপযুক্ত পরিচালক নহে, কিন্তু বৈদ্যুতিক স্রোতের উত্তম পরিচালক। ভূবায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণাঙ্কুষ্ণতাতে কোন রূঢ় পদার্থের সহিত কার্ব্বণের কিছুই সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কার্ব্বণকে লোহিতোত্তপ্ত করিলে কোন কোন রূঢ় পদার্থ, বিশেষতঃ (Oর) অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। যখন উত্তাপিত করা যায়, তখন C (কার্ব্বণ) দগ্ধ ও ভূবায়ুস্থ হয়, এবং প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্ব্বণ অন্যান্য রূঢ় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বাইডস্ বা কার্ব্বিউরেটস্ নামে ব্যবহৃত হয়।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

বিধবা-বিবাহের উপসংহার।

আমরা বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি, এক্ষণে বর্ত্তমানবর্ষের শেষে ইহার শেষ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ দুগ্ধপোষ্য ও বাল-বিধবা রহিয়াছে, তাহাদিগকে কুমারী বোধে তাহাদিগের প্রতিপালন, শিক্ষা দান ও পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত। যে বিধবারা বয়স্কা এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণপূর্ব্বক পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারা গৃহে ও জন-সমাজে পূজনীয়া আদর্শ রমণী হইয়া থাকুন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বলচিত্ত ও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অক্ষম অথচ পতি-

পুত্রবিহীনা হইয়া দারিদ্র্যে পেষিত এবং অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় অন্যের গলগ্রহ হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা শাস্ত্র, যুক্তি ও রাজ-বিধি-বিহিত পুনর্ব্বিবাহের আশ্রয় লউন, তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ ও উন্নতি হইবে এবং জনসমাজেরও প্রভূত মঙ্গল হইবে। আমরা নিজের কথায় আর অধিক না বলিয়া স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রপ্রমাণ ও অকাট্য যুক্তিবলে বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া যে মর্ম্মভেদী হৃদয়-গলিত উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় তাঁহার পুস্তকের উপসংহার করিয়াছেন, আজি তাহাই সাদরে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ৪০ বৎসরের অধিক হইল, তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আজও তাহা প্রযোজ্য। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে দেখিয়া গিয়াছেন, বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে কয়েকটী বিধবার পরিণয় হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে ইহা আরও অধিক এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহার ব্যবস্থা কিছু কিছু অনুসৃত হইয়াছে। দিন দিন সমাজসংস্কারের পথ অল্পে অল্পে খুলিতেছে। কিন্তু আজও সমাজ সংস্কার-সম্বন্ধে অচল অটল হইয়া রহিয়াছে। কবে সমাজ উপযুক্ত ধর্ম্মসাহস অবলম্বন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে সচল ও অগ্রসর হইবেন, আমরা আশানেত্রে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি এবং মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট তাহারই জন্য কায়মনোবাক্যে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি।

উপসংহার।

দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষু-কর্ণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠকমহাশয়-বর্গ! আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক, বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া হত-ভাগ্য বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্ত-রোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত, অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া হতভাগ্য-বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত? এ উভয় পক্ষের মধ্যে, কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশের আচার একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতি-পন্ন করিতে পারিবেন না, সৃষ্টিকাল

অবধি, আমাদের দেশে আচার-পরিবর্ত্তন হয় নাই, এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে এ দেশে, চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ, ক্রমে ক্রমে, আচারের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক, পূর্ব্বতন লোকদিগের সন্তানপরম্পরা, এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের আচারের কত পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে শূদ্রের অপরাধের সীমা থাকিত না; এক্ষণে, সেই শূদ্র উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণেরা, সেবাপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায়, সেই শূদ্রাধিষ্ঠিত উচ্চ আসনের নিম্নদেশে উপবেশন করেন। আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, অতি অল্পকালের মধ্যেও দেশাচারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। দেখুন রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি, বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে, বৈদ্যজাতি এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না; এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। যাঁহারা নূতন আচার অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে আপনারা দেশাচার-পরিত্যাগী সদাচার-পরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না। দত্তকচন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর অবধি, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের উপনয়নযোগ্য কালমধ্যে, আর শূদ্রের বিবাহযোগ্য কালমধ্যে, গ্রহণ করিলেই দত্তকপুত্র সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সকল বর্ণেরই পাঁচ বৎসর মধ্যে গ্রহণ করিয়া, চূড়াকরণ-সংস্কার না করিলে, দত্তকপুত্র সিদ্ধ হইত না। ঐ সমস্ত দেশাচার শাস্ত্রমূলক বলিয়া, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, পরে অন্য শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হওয়াতে, তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা অনুসারে পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে যে নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে, যখন আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, তখন হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রস্তাবিত বিষয়, পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা, সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন, যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত

ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচগ্রহণ না করিতেন; এবং পাঁচ বৎসরের অধিক-বয়স্ক বালক গৃহীত হইলে, দত্তকপুত্র সিদ্ধ না হইক, তাহা হইলে লোকসমাজের কোনও কালে, কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন! আপনারা ইতঃপূর্ব্বে, কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই, পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে, অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে, যখন শাস্ত্র পাইতেছেন, এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে, বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয়, স্পষ্ট বঝিতেছেন, তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদের কোনও মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ, দেশাচারের দোহাই দিয়া, আর আপনাদের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের মধ্যে অনেকে, দেশাচার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন; এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও, কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না। হায়, কি আক্ষেপের বিষয়! দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন; দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত-বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া গণ্য মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া কালাতিপাত করে, কিন্তু

লৌকিকরক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিকরক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণমাত্র করিলেও এককালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়। হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান! হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাই সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে; আর তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই, এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিকরক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগা! তুমি, তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচার গুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু, তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্ব-শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত-কালে তোমার দুরাবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনু-যায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ; দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ; দৃঢ় সংকল্প করিয়া লৌকিক-রক্ষা-ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ; তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক-রক্ষা-ব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে

পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা-ভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

ভারতীয় পুণ্যনদী।

(৪৮৫-৮৬ সংখ্যা—২৯১ পৃষ্ঠার পর)

দেবপ্রয়াগ।

দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী অলকানন্দার সহিত সম্মিলিত হইতেছে। প্রয়াগ শব্দের যৌগিক অর্থ (প্র সম্যক + যজ্ দেবপূজা করা + অ—ধি; অথবা প্র প্রকৃষ্ট + যাগ যজ্ঞ) যথায় প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ বা দেবপূজা করা হয়। ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষিগণ যথায় যজ্ঞ করিয়াছেলেন। ব্রহ্মকুণ্ড, বশিষ্ঠকুণ্ডাদি তাহার প্রমাণ। গাড়োবালে আরও চারিটী প্রয়াগ আছে, তাহা

যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। দেবপ্রয়াগ অতি পবিত্র ও পরম তীর্থস্থান। সংযুক্ত ধারা এই স্থান হইতেই গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানটী সমুদ্রের সমতল হইতে ১৯৫৬ পাদ উচ্চ। হরদ্বার হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূর। সঙ্গমস্থলে যুক্ত নদীর বিস্তৃতি ২৪০ পাদ; কিন্তু ইহার বেগ এত প্রবল যে, তীর্থযাত্রিগণ একটী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া কূলে অথবা পাদার্দ্ধ জলে বসিয়া জলপাত্রে জল তুলিয়া স্নান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। একদিকে ভাগীরথী, অপর দিকে অলকানন্দা। ভাগীরথীর মূর্ত্তি অতীব ভীষণ। সমুচ্চ সানুদেশ হইতে প্রচণ্ডবেগে কলকল নিনাদে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইয়া উভয়তীরস্থ ঘন পাষাণ-প্রাচীর বিকম্পিত করিতেছে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিপর্য্যস্ত ও সঞ্চালিত হইতেছে এবং দোদুল্যমান ফেনরাজী নৃত্য করিতে করিতে অলকানন্দার বক্ষে বিলীন হইতেছে। ভাগীরথীর উভয় কূলই রুক্ষোপলময় মসৃণ ও প্রশস্ত। অলকানন্দার উভয় কূলও রুক্ষোপলময়, কিন্তু ভাগীরথীর অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় ৭০।৭৫ হস্ত ঋজুভাবে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার আয়তনও ভাগীরথী অপেক্ষা বৃহত্তর ও সুগভীর হইলেও সঙ্গমস্থলে ইহার বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দ। পূর্ণতোয়া প্রশান্তভাবে প্রচণ্ড তরঙ্গিণী ভাগীরথীকে আলিঙ্গন করিতেছে। ইহার বিস্তৃতি ১৪২ পাদ, বর্ষাকালে জলরাশি ৪০।৫০ পাদ উচ্চ হইয়া থাকে। তরঙ্গের অপ্রাবল্য হেতু অলকানন্দায় অপর্য্যাপ্ত মৎস্য দৃষ্ট হয়। ৩।৪ হস্ত পরিমিত বৃহৎ বৃহৎ রোহিত মৎস্য ও ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ সোহস মৎস্য সকল দলে দলে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা এত নির্ভীক ও শান্ত যে যাত্রীদিগের হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের গাত্র স্পর্শ করিলেও পলায়ন করে না। পবিত্র বোধে এখানে কেহই মৎস্য ধৃত বা আহার করে না। এখানে ভাগীরথীর বিস্তৃতি ১১২ পাদ। বর্ষাকালে ইহারও জলরাশি ৪০।৫০ পাদ উচ্চ হইয়া থাকে। উভয় নদীর উপরেই সেতু আছে। ইতিপূর্ব্বে ঝোলা বা রজ্জু-সেতু ছিল।

অলকানন্দা ও ভাগীরথী উভয় নদীর সঙ্গমস্থলেই দেবপ্রয়াগ নগর প্রতিষ্ঠিত। অলকানন্দা পূর্ব্বদিক্ হইতে এবং ভাগীরথী উত্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া পরস্পরে সরলরৈখিক কোণাকারে সম্মিলিত হইয়াছে। নদীর সমতল হইতে শতপাদ উচ্চে একটী সমুচ্চ নগ-শৃঙ্গে নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চাতের সানুমানের উচ্চতা আটশত পাদ। তীর হইতে নগর পর্য্যন্ত পর্ব্বত কাটিয়া সোপানশ্রেণী প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নগরে অধিরোহণ ও তথা হইতে সহজে অবতরণ করা যায়। গৃহসকল অসমভাবে উভয় নদীর অন্তঃকূলোপরি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থাপিত। ভাগীরথীর অভিমুখী গৃহশ্রেণী অপেক্ষা-

কৃত দীর্ঘতর। অধিকাংশ গৃহই দ্বিতল ও প্রস্তরনির্ম্মিত এবং ঢালু ছাদ তক্তা দ্বারা আবৃত। নগরের উচ্চপ্রদেশে রঘুনাথজীর (রামচন্দ্রের) বৃহৎ মন্দির। চারি হস্ত উচ্চ উন্নত সমচত্তরপ্র প্রস্তরময় আয়ত অঙ্গনের উপর মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুভ্র শিখরদেশ উজ্জ্বল তাম্রপত্রে মণ্ডিত; চূড়ায় সুবর্ণগোলক ও ত্রিশূল, পতাকাসহকারে সুশোভিত রহিয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে প্রবেশ-দ্বার। তোরণের অভ্যন্তরে বিবিধ আকারের ঘণ্টা সকল দোদুল্যমান। যাত্রিগণ এই সকল ঘণ্টাবাদ্য দ্বারা আরাধ্য দেবতার বোধন সম্পাদন করিয়া থাকে। মন্দিরের পূর্ব্বভাগে গর্ভগৃহে রামচন্দ্রের পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিটী কৃষ্ণোপলে খোদিত, চারি হস্ত উচ্চ দিব্যাসনে উপবেশিত; মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ রক্ত বর্ণে রঞ্জিত। বিগ্রহের সম্মুখে, তোরণের বিপরীতভাগে, ধাতুময় গরুড়ের প্রমাণ প্রতিমূর্ত্তি। গরুড় এক হাঁটু ভূমে গাড়িয়া দুই হস্ত যোড় করিয়া প্রভু রামচন্দ্রের বন্দনা করিতেছে। মন্দিরের উচ্চতা ৭০।৮০ পাদ। উন্নত অঙ্গনের নিম্নদেশে মহাদেবের মন্দির। প্রধান পাণ্ডা বলেন যে, মন্দির ও দেবমূর্ত্তি দশ সহস্র বৎসরেরও অধিক নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও পাণ্ডাদিগের প্রাদুর্ভাব। সঙ্গম-স্থলে ও তন্নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড, বশিষ্ঠকুণ্ড, প্রভৃতি তিনটী কুণ্ড খনিত আছে। তন্মধ্যে বশিষ্ঠ কুণ্ড অলকানন্দার উপরে এবং ব্রহ্মকুণ্ড ভাগীরথীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রীদিগকে এই তিনটী কুণ্ডেই স্নান দান ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। কুণ্ড কয়েকটি স্রোতের সমতলের কিঞ্চিৎ নিম্নে অবস্থাপিত, সুতরাং বেগের প্রচণ্ডতা নিবন্ধন অবরোহণ অসম্ভব। যাত্রিগণের অধিকাংশই আচমন বা স্পর্শন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্প হইয়া মন্দিরের ও নগরের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। দৌলত রাও সিন্ধিয়া ব্রাহ্মণ-স্থপতি আনয়ন করিয়া আবশ্যক সংস্কারাদি করাইয়াছিলেন। এতদর্থে তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। সেবা ও যজন কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য গাড়োবাল-রাজ পঞ্চবিংশতিখানি গ্রাম দেবস্ব প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যাত্রীদের হইতেও অল্প অর্থ সংগৃহীত হয় না।

দেবপ্রয়াগে সার্দ্ধ দুইশত গৃহ আছে। অধিবাসীদিগের অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। এখানে গ্রীষ্মকালে কখন কখন গ্রীষ্মের আধিক্যও হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে ছায়াতলে তাপমান যন্ত্র (১০০°) একশত ডিগ্রীরও উপরে উঠিয়া থাকে। নগরের উচ্চতা সমুদ্রের সমতল হইতে ২২৬৬ পাদ।

ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান হইতে দেবপ্রয়াগ ন্যূনাধিক ৬০ ক্রোশ।

ইহার উপনদী।

প্রথম—কেদার গঙ্গা* ১২ ক্রোশ দীর্ঘ।

* কেদার গঙ্গা। কোন কোন মতে কেবল

দ্বিতীয়—জাহ্নবী ১৫ ক্রোশ দীর্ঘ। সঙ্গমস্থল ভৈরোঘাটী।

তৃতীয়—রিতল, পার্ব্বতীর প্রবাহ।

চতুর্থ—জলকর ১০ ক্রোশ দীর্ঘ।

পঞ্চম—বিলং, ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ।

ভাগীরথীর উপর তীর্থ, গ্রাম ও নগর।

(১) গঙ্গোত্রী—উৎপত্তিস্থান হইতে ৪।৫ ক্রোশ দুর। তীর্থ।

(২) ভৈরোঘাটী—গঙ্গোত্রী হইতে ৩॥ ক্রোশ দুর। তীর্থ।

(৩) ভাতেরি গ্রাম—ভগ্ন ও পরিত্যক্ত-প্রায় গ্রাম।

(৪) মুখী—ভৈরোঘাট হইতে ৬॥ ক্রোশ। গ্রাম।

(৫) উতল—মুখী হইতে ১৮ ক্রোশ। গ্রাম।

(৬) সুরথ—উতল ,, ৭॥ ক্রোশ। গ্রাম।

(৭) তীরী—সুরথ ,, ৮॥ ,,। নগর।

(৮) দেবপ্রয়াগ তীরী হইতে ১১ ক্রোশ। তীর্থ। নগর।

একটী নীহার-গলিত ধারামাত্র। স্বল্পগাধ ও ৭।৮ হাত বিস্তৃত, অনধিক দুই ক্রোশ দীর্ঘ; ইহা একটি দুর্গম কন্দর হইতে নিঃসৃত হইতেছে। কিন্তু হিমালয়ভ্রমণকারী ফ্রেজার বলেন, ইহা দ্বাদশ ক্রোশ দীর্ঘ; প্রবল স্রোতস্বতী, দেবদারু পর্ব্বত (Cedar Mountain) হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গোত্রীর নিকটে ভাগীরথীর বাম দিকে পতিত হইতেছে। সামান্য বোধে যথাস্থানে প্রদর্শিত হয় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

অলকানন্দা।

ভাগীরথী ভগীরথ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে আনীত। কিন্তু অলকানন্দা স্বর্গঙ্গা, স্বতঃ স্বর্গ হইতে অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছে। পুরাণে ইহার মাহাত্ম্য ব্যতীত আর কোন দৈবিক বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয় না, সুতরাং আমরাও তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিয়া ইহার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গাড়োবালের উত্তর সীমায় হিমাচলের বক্ষঃস্থিত নীহারময় হ্রদ হইতে একটী অনতিবিস্তৃত পূতধারা নিঃসৃত হইয়া কিছু দুর পূর্ব্বে সুমন্দগতিতে সরস্বতী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই পূত ধারাই অলকানন্দার মৌলিক স্রোত। ইহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের সমতল হইতে ১৩৮১৫ পাদ উচ্চ। সরস্বতী গঙ্গা হিমাচলের উত্তুঙ্গ উত্তর শিখর হইতে উৎপন্ন হইয়া কয়েক ক্রোশ ১৮০০২ পাদ উচ্চদেশে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গরুড় গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গরুড় গঙ্গা একটী নীহার-গলিত ধারা মাত্র। সংযুক্ত ধারা কিয়দ্দূর দক্ষিণবাহিনী হইয়া অলকানন্দায় আত্মসমর্পণপূর্ব্বক অলকানন্দা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন ভূগোলবেত্তার মতে সরস্বতী গঙ্গা ও ধৌলী নদীর সংযোগে অলকানন্দার উৎপত্তি। কেহবা ধৌলী ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে অলকানন্দার আবির্ভাব

অনুমান করেন। কোন কোন মতে বিষ্ণুগঙ্গা অলকানন্দার অংশবিশেষের নাম মাত্র। কাশীস্থ পঞ্চগঙ্গা তীর্থে যেরূপ পঞ্চনদীর অস্তিত্ব কল্পিত, ইহাও তদ্রূপ। তজ্জন্য কেহ কেহ স্রোত-সরস্বতী গঙ্গা হইতে ধৌলীর সঙ্গমস্থল বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত বিষ্ণুগঙ্গা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অলকানন্দার প্রকৃত মূল-দেশ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুগঙ্গা অলকানন্দার একটী ক্ষুদ্র উপনদী মাত্র। ইহারই দক্ষিণ উপকূলে প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ বদরিকাশ্রম।

বদরিকাশ্রম—বর্দ্দীনাথ বা বদ্রীনাথ। বদরিকাশ্রম একটী পৌরাণিক তীর্থ। বদরীনারায়ণ—এখানে নারায়ণ (বিষ্ণু) তপস্যা করিয়াছিলেন এবং দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ অবস্থান করিতেন বলিয়া অদ্যাপি সাধুসন্তগণ তথায় গমন করিয়া থাকেন। ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে প্রতিবর্ষে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দ্বাদশ বৎসরান্তর কুম্ভমেলা উপলক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোকের সমাগম হয়। এখানে শীতাধিক্য প্রযুক্ত কার্ত্তিক মাসে দেওয়ালীর পরদিন হইতে চৈত্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল দেবমন্দির অবরুদ্ধ থাকে। বরফ পড়িয়া পথ ঘাট দুর্গম হয়, সুতরাং ঐ সময়ে তথায় কেহই গমন করে না। পূজারী পাণ্ডাগণ পূজার তৈজস পাত্রাদি মূল্যবান্ সামগ্রী সকল একটি নিভৃত গুহায় আবদ্ধ করিয়া সার্দ্ধ অষ্টক্রোশ দূরবর্ত্তী যোষীমঠে আসিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। শীতাবসানে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে দেওয়ালী পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার মুক্ত থাকে ও পূজাদি কার্য্য সকল নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয়।

আশ্রমপদ—বদরীনাথ তীর্থ-নগর দুইটী উত্তুঙ্গ সানুমানের সানুদেশে প্রতিষ্ঠিত। অধিত্যকার দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ক্রোশ ও প্রসার অর্দ্ধ ক্রোশ। ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত, চতুর্দ্দিক সমুচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত, নিম্নে বিষ্ণুগঙ্গা কলকলস্বরে মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নগরের উন্নত দেশের ৪০।৫০ পাদ উচ্চে, নদীর অব্যবহিত ঢালুর উপর, বদরীনাথের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের শীর্ষদেশ দেবপ্রয়াগস্থ রঘুনাথজীর মন্দিরের ন্যায় উজ্জ্বল তাম্রপত্রে আচ্ছাদিত এবং চূড়া সুবর্ণগোলক ও ত্রিশূলে সুশোভিত। চিত্রিত পতাকা তদুপরি উড্ডীয়মান। পাণ্ডাগণ বহু কালের নির্ম্মিত বলিয়া মন্দিরের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু দৃষ্টে তাহা বোধ হয় না। হিমশিলাপাতে ও ভূ-কম্পে প্রাচীন মন্দির অনেক কাল পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান মন্দির তাহারই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাও ভূকম্পে বিপর্য্যস্ত হইয়া পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে বদরীনাথ বা বদরীনারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। বিগ্রহের একদিকে কুবের ও অপর দিকে নারায়ণ মূর্ত্তি। অদূরে ভিন্ন মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী প্রতিষ্ঠিত। নারদ

শুক্র ও উদ্ধবের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমূর্ত্তিও বিরাজ করিতেছে। বদরীনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবীর পৃথক্ পৃথক্ ভোগও নির্দ্ধারিত আছে। কথিত আছে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুগঙ্গায় স্নান করিবার সময় নদীর গর্ভ হইতে এই বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি দশবার ডুব দিয়া বিগ্রহটীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। পরে মন্দির নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে বদরী-নারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মন্দিরের কিঞ্চিন্নিম্নেই তপ্তকুণ্ড। কুণ্ডটী সম-চতুষ্কোণ, প্রত্যেক দিক্ বিংশতি হস্ত পরিমিত। কাষ্ঠের খুঁটীর উপর তক্তার ছাদের দ্বারা কুণ্ডটী সমাচ্ছন্ন। একটী উষ্ণপ্রস্রবণ হইতে ভূগর্ভ-নিহিত প্রণালীর দ্বারা উষ্ণ জল নীত হইয়া সর্পফণার উৎসমুখী হইতে কুণ্ডে পতিত হইতেছে। উষ্ণজলোৎপন্ন ঘন ধূমরাশি অনবরত উত্থিত হইয়া তীব্র গন্ধকগন্ধে দিক্ প্রপূরিত করিতেছে। জল এত উত্তপ্ত, যে স্পর্শ করা যায় না। তজ্জন্য অপর একটি প্রস্রবণ হইতে শীতল জল আনীত হইয়া মিশ্রিত করিয়া তাপসহ করা হইতেছে। যাত্রিগণ এই মিশ্রিত কদুষ্ণ জলেই স্নানক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। তপ্তকুণ্ডস্নানের ফলও প্রত্যক্ষ। যাঁহারা মশকপ্রধান স্থানে অনাবৃত অবস্থায় কিছু-কাল বাস করিয়াছেন, অথবা সিমলা-শৈল প্রভৃতি স্থানের চিলু পীসুর সহিত পরিচিত আছেন, তপ্তকুণ্ড-স্নানের সদ্যো-জাত জোঁ—র কষ্ট তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে সমর্থ। জোঁ একপ্রকার কীটাণু ও সমধিক কষ্টদায়ক। বস্ত্রে ও গাত্রে (চর্ম্মে) সংলগ্ন হইয়া অনেক দিন ধরিয়া কষ্ট দিয়া থাকে। ইহারা বোধ হয় জোঁকের সূক্ষ্মরূপধারী। তপ্তকুণ্ড-স্নান ইহাদিগের জন্য চিরস্মরণীয়। নিকটেই ব্রহ্মকপালী। এখানে তর্পণ ও গয়ার ন্যায় পিণ্ডাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ভারতে পিতৃপুরুষদিগের প্রেতত্ব মোচন বা উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক তীর্থ নিরূপিত আছে। প্রসিদ্ধ গয়াক্ষেত্র, কাশীস্থ পিশাচ-মোচন, কুরুক্ষেত্রে আপ্‌গয়া ও বদরীনাথে ব্রহ্মকপালী তন্মধ্যে প্রধান। এখানে আরও পঞ্চতীর্থ ও পঞ্চশিলা আছে। পঞ্চ-তীর্থ—যথা ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদ-ধারা, সৌরীকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড। অতিরিক্ত নারদকুণ্ডও একটী প্রধান তীর্থ। পঞ্চ-শিলা—যথা গরুড়-শিলা, নারদ-শিলা, বারা-শিলা, মার্কণ্ড-শিলা ও নৃসিংহ-শিলা। ভারতের পরমতীর্থ ও উত্তর খণ্ডের মহা-স্থলী বলিয়া বদরীনাথ বৈকুণ্ঠ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও জাতিবিচার নাই। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই সমভাবে অসঙ্কোচে একত্রে আহার বিহার করিয়া থাকে। যাত্রিদত্ত পূজা ও উপহার ব্যতীত গাড়োয়াল ও কুমায়ুন প্রদেশে ২২৬খানি গ্রাম দেবত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল গ্রাম গাড়োয়াল-রাজ বদরীনারায়ণের সেবার্থ প্রদান করিয়াছেন। পূজারী ও পাণ্ডাগণ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। প্রধান পাণ্ডা

রাওল নামে পরিচিত। সকল পাণ্ডাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। সকলেই চিরকৌমার-ব্রতধারী, তজ্জন্য অধিকাংশই দুশ্চরিত্র। তীর্থের মাহাত্ম্যে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় বলিয়াই বুঝি মহাপীঠ ও প্রধান তীর্থ-স্থানে পাপ-পুণ্যের বিচার নাই। বদরী-নাথ যাইবার পথ দুর্গম না হইলেও বড়ই কষ্টকর। হনুমানচটী হইতে আরম্ভ হইয়া ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ পথ "চড়াই" উপরে উঠিয়াছে। ইহা গাড়োবাল-রাজ-ধানী শ্রীনগর হইতে ২৮ ক্রোশ দূর। বদরীনাথের মন্দিরের ছয় ক্রোশ পশ্চিমে ছয়টী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত আছে। ইহারা বদরীনাথ শৃঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের উচ্চতা ২২০০০ পাদ হইতে ২২৫০০ পাদ। ইহার নৈঋত কোণে ও তিন ক্রোশ দূরে আর একটী শৃঙ্গ আছে, তাহার উচ্চতা ২১,৩৮৫ পাদ। বদরীনাথের পশ্চিম হিমাচলে অনেকগুলি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—

নন্দদেবী	উচ্চতা	২৫,৬৬১ পাদ
কমেত	"	২৫,৪১৩ "
ত্রিশূল	"	২৩,৩৪২ "
ধুন গিরি	"	২৩,১৮১ "
বদরীনাথ	"	২৩২১০ "
কেদারনাথ	"	২২,৮৫৩ "

রেল হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের অপকারিতা।

শ্রীক্ষেত্রে রেল হওয়ায় রেল-কোম্পানীর যথেষ্ট আয় হইয়াছে। দেশের লোকের পক্ষেও অতিশয় সুবিধার কারণ হইয়াছে। কিন্তু রেল হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের যত অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা স্মরণ হইলে বড় কষ্ট হয়। শ্রীক্ষেত্র অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। সমুদ্রের হাওয়া যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি উষ্ণ ও পাচক। শ্রীক্ষেত্রে তুলসীগাছ বড় বেশী, ধূপের গন্ধে ত্রিসন্ধ্যাতেই সহরের অধিকাংশ স্থানই সুরভিত। তুলসীপত্রের হাওয়া অতি পরিষ্কার। অনেক দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানও নির্ম্মাল্য চন্দনের সুগন্ধে সুরভিত। এই সব কারণেই হয়ত শ্রীক্ষেত্রের স্বাস্থ্য এত সুন্দর। কিন্তু হায়! রেল হওয়া অবধি অনেক লোকের সমাগমে শ্রীক্ষেত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যোগের সময় শ্রীক্ষেত্রের দুর্দ্দশা এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। প্রত্যেকবার রথের সময় মহামারী উপস্থিত হয়। শ্রীক্ষেত্রে কলেরাত একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। সময় সময় বসন্তও উপস্থিত হয়। প্লেগটা বাকী ছিল, এবার দোলে প্লেগটা দেখা দিয়াছিল। দোলের একদিন পূর্ব্ব হইতেই ইন্দুর বিড়াল মরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বসন্তেরও খুব ধুম লাগিয়াছিল।

এবার দোলযাত্রায় ৭০ হাজার যাত্রী হইয়াছিল। দিনে তিনবার স্পেশেল ট্রেণ

কলিকাতা হইতে পুরী যাতায়াত করিত। এত লোকের একত্র সমাবেশে কেনই বা কলেরা, বসন্ত ও প্লেগের আবির্ভাব না হইবে?

কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যাত্রীর পরিমাণ বুঝিয়া ট্রেণ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কাহারও হয়ত এরূপ ইচ্ছা নয় যে, শ্রীক্ষেত্রে একটা ভীষণ মহামারি উপস্থিত হইয়া দেশ ছারখার হয়, অথবা লক্ষ লোকের প্রাণসংহার হয় এবং নানারূপ সংক্রামক রোগে এমন সুন্দর শ্রীক্ষেত্র শ্রীহীন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়ায়। এখনও শ্রীক্ষেত্রে রীতিমত প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এখনও সতর্কতার যথেষ্ট সময় আছে। দোলের সময় কিঞ্চিৎ প্লেগ দেখা দিয়াছিল, রথের সময় হয়তো প্লেগ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া বসিবে এবং অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিবে। সোণার শান্তিকুঞ্জে অশান্তির অনলবৃষ্টি হইবে! হায়! হায়! সে দুঃখের কথা স্মরণ হইলেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। গয়ায় প্লেগ ধরিয়াছে, বৈদ্যনাথেও প্লেগ হইয়াছে, শ্রীক্ষেত্র কেবল আপনার স্বাস্থ্যবলে এখনও একরূপ ভাল আছে, কিন্তু এই বার রথের সময় হইতেই যদি কর্তৃপক্ষ সাবধান না হন, তবে অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের মত স্বাস্থ্যকর স্থানেও প্লেগ ধরিবে, পশ্চাৎ শত জনের শত চেষ্টাতেও কোনও ফল দর্শিবে না।

রেল-কোম্পানির আয়ের জন্য শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের প্রত্যেক পর্ব্ব উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রী যাইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় না। এক স্থানে এত লোকের মিলনই সর্ব্বনাশের মূল।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস।

নলিনীর শিক্ষা।

১

বেলা চারিটার সময়ে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছুটী হইয়া গেল। সব মেয়েরা আপনাপন বাসায় চলিল। তন্মধ্যে একটি বালিকা কিছুদূর গিয়াই পুনরায় বালিকা-বিদ্যালয়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। দেখিল প্রায় সকল মেয়েই চলিয়া গিয়াছে, দুই চার জন বাকী রহিয়াছে, তাহারাও যাইবার জন্য উদ্যত। একটা বালিকা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ঐ বালিকার মুখ রাগে রক্তবর্ণ হইল। বালিকার নাম নলিনী। সে খুব বড় লোকের মেয়ে। পড়াশুনায় নলিনীর মোটেই মন নাই, বরং বড়লোকের মেয়ে বলিয়া সে স্কুলের সকল মেয়েকেই ঘৃণা করিত।

নলিনী সেই বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এক মুষ্টি বালুকা লইয়া বালিকার

গায়ে ছিটাইয়া দিল। বালিকাটী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল "ভাই নলিনি। তুমি আমার গায়ে ধূলা দিলে কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি?"

হাসিতে হাসিতে নলিনী বলিল "বেশ করিয়াছি, স্কুলে আমি শ্লেটে অঙ্ক না কসিয়া ছবি আঁকিতেছিলাম, তা তুই গুরুমাকে বলে দিলি কেন?"

বিভাবরী বলিল "সেত তোমার ভালর জন্যই বলিয়াছিলাম।"

নলিনী আমিত তোর কাপড় ময়লা কর্‌বার জন্য ধূলো দিয়েছি, আরও দিব বলিয়া আরও এক মুষ্টি ধূলা বিভার গায়ে ছড়াইয়া দিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

বিভাবরী খুব শান্ত, ধৈর্য্যশীলা ও নিরীহা বালিকা। এই জন্য নলিনী প্রায়ই বিভার উপর সকলের চেয়ে বেশী অত্যাচার করিত। কিন্তু বিভা কোনও দিনও নলিনীর প্রতি কোনও উচ্চ বাচ্য করে নাই।

বিভার পিতা ২৫৲ টাকা মাহিনার একটি ছোট চাকরি করিতেন। নলিনী ও বিভা এক ক্লাসেই পড়িত। লেখা পড়ায় বিভার খুব মন।

বিভা গায়ের ধূলাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাসায় চলিল।

২

বিভা বাসায় গেল। বিভার মা বলিলেন—বিভা! তোর মুখখানি এত বিষণ্ণ কেন বাছা। ওমা! কাপড়ে এত ধূলো লাগিল কি করে? বুড়ো মাগী হয়েছ, তবু একটু জ্ঞান নেই? আর কি প'রে স্কুলে যাবি বল দেখি, ভাল কাপড় আর যে বাক্সে নাই।

বিভা। না মা! আমি কাপড়ে ধূলো লাগাই নাই, নলিনী দিয়েছে।

মা। নলিনী কে?

বিভা। স্কুলের একজন ছাত্রী, ঐ যে সে দিন সে আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছিল।

মা। সে মেয়েটা ত বড় বজ্জাৎ, তা গুরুমাকে বলে দিস্‌নে কেন?

বিভা। না মা! তা হলে কি হয়? নলিনী তার বাপ মায়ের বড় আদুরে মেয়ে, তাকে কিছু বল্লে, তার ভাইরা এসে গুরু মাকে কত কি বলে। তাই গুরু মা নলিনীকে বেশী কিছু বলেন না।

"তুই তার সঙ্গে যাস্‌নে" বলিয়া বিভার মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে বিভা স্কুলে চলিল। স্কুলে সে সবার চেয়ে ভাল ছাত্রী, গুরুমা তাহাকে খুব ভালবাসেন।

বিভা স্কুলে গিয়া লতিকা-নাম্নী একটী বালিকার নিকট নলিনীর বালি দেওয়ার কথা বলিল। লতিকা তৎক্ষণাৎ গিয়া গুরুমাকে বলিয়া দিল।

গুরু মা নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "নলিনী! তুমি বিভার গায়ে বালি দিয়াছ?"

নলিনী। হাঁ দিয়েছি বৈকি।

গুরু মা। কেন দিয়াছ?

নলিনী। আমার ইচ্ছা।

গুরু মা। আজ তুমি সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাকিবে।

নলিনী প্রথমতঃ ভাবিল বিভা বলিয়া দিয়াছে; তৎপরে যখন শুনিল বিভা বলে নাই লতিকা বলিয়াছে, তখন সে মনে মনে বলিল 'এর প্রতিশোধ লইতেই হইবে।'

গুরু মা পড়া দেখাইয়া দিলেন, রাগে পড়ার কথা নলিনীর মনে রহিল না।

স্কুলের ছুটী হইবামাত্র নলিনী বাহিরে আসিয়া লতিকাকে খুঁজিতে লাগিল। লতিকা নলিনীর ভয়ে একটী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল, নলিনী বাসায় গেলে সে বাসায় যাইবে এই তাহার ইচ্ছা। কিন্তু নলিনী গাছের অন্তরাল সত্বেও লতিকাকে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল। বৃক্ষের নীচে লতিকার সেট বই ছিল, লতিকা তাহা পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া নলিনীর দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইল। নলিনী লতিকার কাছে আসিয়া বলিল "পোড়ারমুখী! আমি বিভার গায়ে বালি দিয়াছিলাম তা তোর এত মাথাব্যথা কেন? তা তুই গুরু-মাকে বল্‌লি কেন?"

লতিকা। পোড়ারমুখী! তুই আমাকে পোড়ারমুখী বলবার কে? গুরুমার কাছে বলে বেশ করেছি।

তখন দুইজনে মারামারি হইতে লাগিল, নলিনী লতিকার সঙ্গে না পারিয়া লতিকার পশ্চাদ্দিক্ হইতে একখানি বই লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, লতিকাও তাহার বই ছিঁড়িতে যাইতেছিল, কিন্তু নলিনী দৌড়িয়া অন্য পথে চলিয়া গেল।

৩

নলিনী এ পর্য্যন্ত স্কুলে কাহারও মার বা গালি খায় নাই, সকলেই তাহার মার ও গাল খাইয়াছে—শব্দটী করে নাই। আজ লতিকার মার ও বকুনি খাইয়া নলিনীর বড় রাগ হইল, সে ভাবিল ইহার শাস্তি দিতেই হইবে।

বাসায় গিয়া নলিনী দেখিল মা ঘুমাইতেছেন। সে বই রাখিয়া মেজের উপর পা ছড়াইয়া কান্দিতে লাগিল।

মাতার ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি নলিনীকে কান্দিতে দেখিয়া বলিলেন "নলিনি! কান্দ কেন মা?"

নলি। "লতিকা মেরেছে।"

মা। লতিকা কে?

নলি। স্কুলের একজন ছাত্রী।

মা। তোকে মারলে কেন?

নলি। শুধু শুধু।

মা। শুধু শুধু কি মানুষ মানুষকে মারতে পারে?

নলি। সে পড়া পারে নি, আমি পেরেছি, তাই আমাকে মেরেছে।

মা। তুই মারলিনে কেন?

সাধুতার ভান করিয়া নলিনী বলিল "আমি কাউকে মারি নে। মা! ছোট দাদা আসুক, তাকে তুমি লতিকাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। ছোট দাদা গিয়ে লতিকার বাপ মাকে লতিকাকে শাসন করতে বলে আসবে।"

মা। তুই লতিকাদের বাড়ী চিনিস্?

নলি। না চিনিলেও তার বাপের নাম যদুপতি রায়। সে উকীল, ছোট দাদা চিন্‌বে না?

মা। জ্যোতি আসুক ত?

এমন সময় নলিনীর ছোট দাদা জ্যোতি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। নলিনীর মা তাহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

"আমি যদুপতি বাবুর বাসা চিনিনে" বলিয়া জ্যোতি চলিয়া গেল।

জ্যোতি আলস্যবশতঃ বলিল সে যদু বাবুর বাসা চিনে না। নলিনী ভাবিল সত্যই জ্যোতি যদুবাবুর বাসা চিনে না। সে বলিল মা! আমি কাল লতিকাদের বাসায় গিয়ে সে বাসা চিনে আসব।

"সেই ভাল বাছা" বলিয়া মা মুখ-প্রক্ষালনের জন্য বাহিরে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় যখন নলিনীর মাষ্টার নলিনীকে পড়াইতে আসিলেন, তখন নলিনী বড় মুস্কিলে পড়িল, গুরু-মা কতটুকু পড়া দিয়াছেন, তা ত নলিনীর মনে নাই।

নলিনী পড়ার কথা মাকে বলিল। মা বলিলেন "তা তুই কি তোদের ক্লাসের কোনও মেয়ের বাসা চিনিসনে?"

নলিনী শুধু বিভাদের বাসা চিনিত। কিন্তু সেত সেদিন বিভার গায়ে ধুলা দিয়াছিল, আরও কত দিন কত লাঞ্ছনা করিয়াছে, বিভাও যদি আজ পড়া না দেখাইয়া দেয়। কিন্তু কি করে, নলিনী সাহসে ভর করিয়া বিভার বাসায় চলিল।

বিভা তাহাদের বাসায় নলিনীকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহার হাত ধরিয়া মাদুরে বসাইয়া বলিল "ভাই নলিনি! আজ কি জন্য এখানে আসিয়াছ? বিভার কথায় নলিনীর মন গলিয়া গেল। মৃদুস্বরে সে বলিল "কতটুকু পড়া ভুলিয়া গিয়াছি।" বিভা সাদরে নলিনীকে পড়া দেখাইয়া দিয়া তাহাকে বাসায় রাখিয়া আসিবার জন্য তাহার সঙ্গে চলিল। কিছু দূরে গিয়াই মুখরা নলিনীর বিভার উপরে রাগ হইল, মনে মনে বলিল পোড়ারমুখী আবার পথ দেখাইতে আসিয়াছেন। আমি আর পথ চিনিনে। প্রকাশ্যে বলিল বিভা! তুই বাড়ী যা।

বিভা। একা যেতে পারবেত?

নলিনী। পোড়ারমুখী! যা শিগ্‌গির বলছি।

বিভা। আমি যাচ্ছি, তুমি যাও।

"গেলিনে দাঁড়া" বলিয়া নলিনী একটা ঢেলা লইয়া বিভার গায়ে ছুড়িয়া দিল। বিভার হাঁটুর উপর ঢেলাটি লাগিয়া ছাল উঠিয়া রক্ত বাহির হইল, চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া গেল, বিভা ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

৪

পর দিন আবার স্কুল হইল। আবার ছুটী হইলে নলিনী লতিকার নিকটে গিয়া বলিল "লতিকা! চল্ তোদের বাড়ী কেমন দেখে আসি।"

লতিকা ভাবিল নলিনীকে জব্দ করিবার

সময় উপস্থিত। সে হাসিয়া বলিল "তা চল্ না"।

লতিকা নলিনীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাসায় উপস্থিত হইল। নলিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসাটী দেখিয়া বলিল "আয় লতিকা! আমাকে বাসায় রেখে আসবি আয়।"

লতিকা। তুই আপনি যা।

নলিনী। সে কি, আমি যে পথ চিনিনে।

লতিকা। না চিন্‌লে, এইখানে বসে বসে আমার বই ছিঁড়্‌বার সুখ বোঝ।

নলিনী বুঝিল লতিকা প্রতিদান লইতে চাহে। সে প্রথমে রাগারাগি, পরে বিনয় করিতে লাগিল। লতিকা হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নলিনী রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল পরিচিত লোক দেখা যায় কি না। নলিনী দেখিল বিভাবরী তাহার ছোট ভ্রাতার জন্য বাজার হইতে মিছরী কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। নলিনী ভাবিল বিভাও লতিকার মত করিবে। কিন্তু বিভা যাই দেখিল নলিনী বিষণ্ণ-মুখে সেই যায়গায় বসিয়া রহিয়াছে, অমনি নলিনীর নিকটে গিয়া বলিল "নলিনি! তুমি এখানে এরূপভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন?"

নলিনী লতিকার কথা বিভার কাছে বলিল। বিভা লতিকাকে মন্দ বলিতে বলিতে নলিনীকে লইয়া নলিনীদের বাসায় চলিল। বাসায় পঁহুছিয়া কৃতজ্ঞতায় নলিনীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। বিভাকে যে সে এত অপমান করিয়াছে, আর বিভা না কি এত অপমান সত্ত্বেও তাহার প্রতি এত স্নেহ প্রকাশ করিতেছে! নলিনী বিভার হাত ধরিয়া বলিল, বিভা! বিভা!! আমি কেন তোমার মত হইলাম না? তুমি দেবী, আজ হইতে তুমি আমার ও আমি তোমার ভগিনী হইলাম।

বিভা সেবার পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে, নলিনী হয় নাই। কিন্তু নলিনীর চরিত্র এখন বড়ই মধুর। সে এখন আর সে নলিনী নাই।

একদিন স্কুলের পর সব ছাত্রীরা একত্র হইয়া ঘুঁটি খেলিতেছিল, খেলিতে খেলিতে দুইটী বালিকায় বিবাদ আরম্ভ হইল। কিন্তু নলিনী—সেই নলিনী আজ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিল।

শিক্ষয়িত্রী বিবাদের ওস্তাদ নলিনীর এরূপ পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও নলিনীকে পুরস্কার স্বরূপ একখানি গার্হস্থ্য শিক্ষা কিনিয়া দিলেন। নলিনী সরল ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিতে লাগিল "আমি মন্দ ছিলাম, বিভার দৃষ্টান্তে এখন ভাল হইয়াছি।"

কুমারী সুরুচি।
মেদিনীপুর।

পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতীর স্মারক কীর্ত্তি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কাশীধামে ভ্রমণে গিয়া স্বর্গগত পরমহংস ভাস্করানন্দের স্মৃতি-চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি। বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে, তাঁহার শিষ্য ও স্থলাভিষিক্ত শ্রীমন্‌ মৈথিলী স্বামী মহাশয় গুরুদেবকে চির-স্মরণীয় করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নশীল। ভাস্করানন্দের সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি, ছবি ও পূজা অর্চ্চনার স্থান রহিয়াছে। ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট নন। যাহাতে স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি হয় এবং জনসাধারণের উপকার হয়, তজ্জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা আয়োজন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও বন্ধুর পত্র নিম্নে প্রকটন করিতেছি।*

পরমহংস ভাস্করানন্দের তিরোভাবের পর অবধি তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীস্বামী স্বয়ং প্রকাশানন্দ মৈথিলী মহোদয় গুরু-দেবের স্মারক কীর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহী হইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাস্কর-পাঠশালা (কলেজ) ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। এক্ষণে ছাত্রসংখ্যা ৪০০ চারিশতেরও অধিক এবং দশজন সুযোগ্য অধ্যাপক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি জটিল শাস্ত্র সকলই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় বিষয়। কোবিদ-প্রবর স্বামীজী স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। অনেক সদাশয় শিষ্য সাধ্যমত অর্থানুকূল্য করিতেছেন। পাঠশালাটি তিন বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। দিন দিন বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, ইহার জন্য একটী স্বতন্ত্র উপযুক্ত বাটীর নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য একটী বৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এতদর্থে প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। অধ্যাপনা, ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি পাঠশালা সংক্রান্ত মাসিক ব্যয়ের সমষ্টিও ছয়শত টাকা। ইহার জন্য সার্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন। তাহার সুদ হইতে এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। স্বামীজী তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্‌। তাঁহার গুরুদেব ও তাঁহার নিজের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল সদাশয় মহারাজা, রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য ভক্ত আছেন, তাঁহারা মনোযোগী হইলে অনায়াসে এই অর্থ সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ তিনি আশা করেন যে, কাশীর ও অযোধ্যার মহা-রাজা এবং আমেতি, প্রতাপগড়, প্রয়াগপুর ও বণেলির রাজগণ হইতেই আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। ইতিমধ্যে

* এই পত্র কিছুদিন পূর্ব্বে সঞ্জীবনীতেও মুদ্রিত হয়।

কয়েক সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং মাসিক অর্থানুকূল্যও নিয়মিতরূপে পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় স্মারক কীর্ত্তি পরমহংস দেবের সমাধি-মন্দির। কাণপুরের বিখ্যাত বণিক্ গয়াপ্রসাদ এতদর্থে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার উইলের প্রতিবাদ করাতে এতদিন উক্ত টাকা আদালতে আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে ও উইল সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমেতির রাজা আনন্দ-বাগ প্রদান না করিলে, সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ হইবে না, উইলে এইরূপ নির্দ্দেশ থাকাতে শ্রীমন্-মৈথিলী স্বামী মহোদয় বিশেষ যত্ন ও অনুরোধ দ্বারা আমেতি-রাজের সম্মতি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং শীঘ্রই মন্দির নির্ম্মাণ হইবে। এই আনন্দ-বাগেই পরমহংস দেব জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। এই স্থানেই তাঁহার স্থূল দেহ সমাধিস্থ আছে। এখানে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, আরতি, ভোগ, ইত্যাদি নিত্যকার্য্য সকল নিয়মিতরূপে রাজব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তদর্থে দেবল, ভৃত্য প্রভৃতিও নিযুক্ত আছে। আনন্দবাগ উদ্যানটি অতি রমণীয় স্থান, দুর্গাকুণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্থাপিত। এখানে আগমন মাত্রেই মনে অদ্ভূত আনন্দ অনুভূত হইয়া আনন্দবাগ নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া থাকে। মৈথিলী স্বামীজি বলেন, সন্ধ্যার পর হইতে যতই রজনী বৃদ্ধি হয়, ততই যেন আনন্দবাগে আনন্দের স্রোত প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়। স্থানের মাহাত্ম্যেই হউক, অথবা সাধুসমাগমজনিতই হউক, বাস্তবিক আমরা অনেক দিন স্বামীজির প্রসাদে পবিত্র পরমানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। স্বামীজি সমাধিমন্দির সং-স্থাপনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র। সত্বরেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে।

তৃতীয় স্মারক কীর্ত্তি ভাস্কর অন্নছত্র। ইহার জন্যও উক্ত মহাত্মা গয়াপ্রসাদ বার্ষিক সার্দ্ধ তিন সহস্র (৩৫০০) টাকা আয়ের একটী সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিগত বিজয়া দশমীর দিন হইতে ছত্রের কার্য্য চলিতেছে। প্রত্যহ ভাস্কর-পাঠশালার ২৫ জন দরিদ্র বিদ্যার্থীর ভোজ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র বর্ণ নির্ব্বিশেষে ১০।১৫ জন দরিদ্র ও অনাহূত দীন ব্যক্তিকে ভোজ্য বিতরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ উভয় কালেই ভোজ্যদানের নিয়ম করা হইয়াছে। এরূপ উদার ব্যবস্থা বড়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু কেবল ভোজ্য বিতরণ না করিয়া অন্নদানেরও ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। অন্নদানই অন্নছত্রের উদ্দেশ্য। অনাথ দীন দরিদ্র প্রস্তুত অন্নেরই প্রত্যাশী। বিশেষতঃ অনেক বিদ্যার্থী ও বিপন্ন অনাহূত তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত

হইবে। রন্ধনের স্থানাভাবে ভোজ্য তাহাদিগের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

ভাস্কর-পাঠশালার সাহায্যার্থে রামব্রহ্ম উপাধ্যায় নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি মাসিক তিন শত টাকা ব্যয়ে একটী স্বতন্ত্র অন্নছত্র খুলিতেছেন। প্রবাসী দরিদ্র ছাত্রগণ ইহাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে।

পালামৌর বন্যজাতি।

(৪৮৫-৮৬ সংখ্যা—৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

বন্য মনুষ্যগণ নিম্নলিখিত কয়েক জাতিতে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত:—খেরওয়ার, চেরো, কোরওয়া, ধান্থক, ভুঁইয়া, ধাঙ্গড়, কোল, ওরাউন, হোস, খিরউয়ার, ভোক্তাস, ডোম, কাহার ইত্যাদি। তন্মধ্যে চেরো, ভোক্তাস ও ওরাউন এই তিন সম্প্রদায় আদিমনিবাসী ও বহু প্রাচীন। চেরো সম্প্রদায়ের উৎপত্তি-স্থান ও আগমন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট যে কয়েকটী জাতির বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই বলিব। ভোক্তাস ছোট নাগপুর বিভাগে সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে পালামৌতে দৃষ্ট হয়। উহারা বহুকাল হইতে পালামৌতে বাস করিতেছে। উহারা রোহিতাস পর্ব্বত হইতে আগমন করে—ইহাদিগকে খিরওয়ারও বলা হয়। তাহারা খিরওয়ার পর্ব্বতে পূর্ব্বে বাস করিত এবং তন্নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্য তাহাদের নামানুসারে সম্ভবতঃ খিরা হইয়াছে। খিরওয়ার সন্নিকটবর্ত্তী তুরকীরাজ, হাজারিবাগের পশ্চিমে অবস্থিত কুণ্ডারাজ এবং পালামৌ অন্তর্গত চিচারির (ভায়া রাজা) উক্ত জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ভোক্তাসগণ সচরাচর ঘোর কৃষ্ণকায়, বিরাটমূর্ত্তি ও কদাকার। তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ তাহাদের নহে, কারণ তাহারা কালের পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া সেই সেই জাতির ভাষা ও আচার কয়েকটী গ্রহণ করিয়াছে—কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীও হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পর যাহারা কোন কারণে সমাজ ও জাতিচ্যুত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকেই কোল বলা হয়। কোল অর্থ "হিন্দুসমাজ-চ্যুত।" ছোট নাগপুরের কোলদিগকে ওরাউন বলা হয়। হোস সম্প্রদায় আর্য্যগণের সমাগমে তাহাদের আদিম স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া কতক সিংহভূমে ও কতক পালামৌতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইহারা সূর্য্যদেবের উপাসক—তীর ধনুক, ও কুঠার ইহাদের কেবল মাত্র

অস্ত্র। ইহাদিগকেও কোন শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। বগ্গ ও কোলদিগের মধ্যে ইহারা সুশ্রী ও দীর্ঘাকৃতি।

ডোমদিগের বিষয় বলা নিষ্প্রয়োজন— কারণ ডোম সর্ব্ব দেশেই আছে। ইহারা কুকুর মাংস ভক্ষণ করে। এই সকল বন্যজাতি সভ্য ও শিক্ষিত মনুষ্য সমাগমের পূর্ব্বে বড়ই নিরীহ, সত্যপ্রিয় ও সরলপ্রকৃতি ছিল। এখনও অনেক স্থানে তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের ন্যায় অন্যায় বুঝিবার ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তির বড়ই অভাব। ক্ষুধার সময় সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য না থাকিলে অসঙ্কোচে পরের খাদ্য উঠাইয়া লইয়া ভক্ষণ করে। না বলিয়া লইলে যে চুরি করা হয় অথবা কাড়িয়া অপরের দ্রব্য ভক্ষণ করা যে অন্যায়, ইহা তাহাদের বিবেক বলিয়া দেয় না। তাহাদের ভাবে বোধ হয় যেন সমস্তই আপনার— পর বলিয়া একটা কোনও বস্তু নাই। আমার সম্মুখে খাদ্য নাই, তোমারটা সম্প্রতি খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম, সময়ান্তরে তোমার না থাকিলে আমারটা অনায়াসে বিনা বাক্যব্যয়ে খাইতে পার। বাস্তবিক ইহারাই হিতোপদেশের "উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। চিন্তাশক্তির অভাবে ভবিষ্যৎ কদাপি চিন্তা করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী প্রকৃত ঘটনা নিম্নে দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ কোন এক অরণ্যে সরকারী কার্য্যে গিয়াছিলেন। বৃক্ষের নিম্নে ও ইন্‌সপেক্‌সন বাঙ্গলার চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি বন্যকে অত্যন্ত শীতহেতু স্ত্রীপুত্রসহ কাঁপিতে ও আর্ত্তনাদ করিতে শুনিয়া তিনি বড়ই দয়ার্দ্র হইয়া সকলকে এক একখানি কম্বল বিতরণ করিলেন। উহারা কম্বলে দেহাবৃত করিয়া দারুণ শীত হইতে রক্ষা পাইয়া বড়ই চমৎকৃত হইল—সাহেবের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। পরে নরনারী শিশু একত্র হইয়া আনন্দধ্বনি ও সাহেবের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করতঃ নিজ ভাষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে ধন্যবাদসূচক সঙ্গীত করিয়া চলিয়া গেল। উক্ত সাহেব পর বৎসর গ্রীষ্মের সময় পুনরায় সেই স্থানে গিয়া কম্বল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তাহারা বলিল "তাহার পর আর আবশ্যক না হওয়ায় সেই সমুদয় কম্বল ফেলিয়া দিয়াছি।" সাহেব তাহাদের চিন্তাশক্তির এতদূর অধোগতি দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। আহা! আজ কাল আর সে দিন নাই। দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন, মূর্খ, নিরীহ জীব বলিয়া ইহারা সভ্য ও শিক্ষিত লোকদিগের নিকট দয়ার পাত্র না হইয়া নিষ্ঠুরভাবে সর্ব্বদা নিপীড়িত হইয়া থাকে—অশ্বাভাবে পশুর ন্যায় শকট টানাইয়া পারিশ্রমিক পরিবর্ত্তে পদাঘাতে দূরে নিক্ষিপ্ত করা হয়—আরও সময় সময় হাকিম কর্ত্তৃক বিশেষ "হাকিমের পেয়াদা" কর্ত্তৃক যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহারিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

বেগারী ধরা প্রথাটা অত্যন্ত কদর্য্য ও শোচনীয়।

এই দেশের প্রচলিত পয়সাকে "কাঁচ্চা" বলিয়া থাকে, তাহা অনেকটা গোরক্ষপুরী পয়সার ন্যায়। উক্ত দুই কাঁচ্চা একত্র হইলে তাহারা উহাকে এক টাকা বলে। বন্যেরা কাঁচ্চা পর্য্যন্তই চিনে, ইহার পর কোন খোঁজ রাখে না। ১৲ টাকায় কখন ২৭ গণ্ডা, কখন ৩০ গণ্ডা, কখন বা ২৫ গণ্ডা করিয়া কাঁচ্চা পাওয়া যায়। ১॥ কাঁচ্চায় এক পয়সা। আমাদের দেশী অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত পয়সাকে ইহারা বড় পয়সা বলে। এই বন্যদিগকে পুরস্কার বা পারিশ্রমিক স্বরূপ কাঁচ্চা না দিয়া আধুলি, সিকি বা দু'আনি দিলে উহারা ফেলিয়া দেয় বা অলঙ্কারজ্ঞানে বন্যনারীদিগের কপালে লাগাইয়া দেয়। ইহাদের সখও বিলক্ষণ আছে—কেহ লাল বা পীতবর্ণের কাপড় দিলে প্রীত হয়—বোম্বাই সাড়ীর ন্যায় মূল্যবান জ্ঞানে যত্নে উঠাইয়া রাখে, কোন পর্ব্ব বা আমোদ উপলক্ষে স্ত্রীকে পরায়। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গ উল্‌কিতে পরিপূর্ণ। একবার একটী সপ্তমবর্ষীয়া বালিকাকে দেখিলাম। তাহার পিতা মাতা তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়াছে এবং একজন (যাহার উল্কি পরান কাজ) সূচিকা দ্বারা সমস্ত শরীর বিদ্ধ করিয়া কোন স্থানে তাহাদের দেবীমূর্ত্তি, কোন স্থানে ত্রিভুজাকার ইত্যাদি নানা চিত্র অঙ্কিত করিতেছে এবং সেই বালিকা রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতেছে—কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, কারণ উহা না হইলে স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না।

বিজ্ঞান-রহস্য।

দেহতত্ত্ব—মস্তিষ্ক।

মস্তকের করোটি মধ্যে সূক্ষ্ম সূত্রসমষ্টির ন্যায় শিরাময় যে তরল পিণ্ড অবস্থিতি করে, তাহাই মস্তিষ্ক। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা ঘৃতবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া সামান্য কথায় ইহাকে মস্তকের ঘৃত বা মগজ বলিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড যেরূপ রক্তাধার, রক্তধারা বেগে তথা হইতে সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয়; মস্তিষ্কস্থ সূক্ষ্ম শিরাসকলও তদ্রূপ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মস্তিষ্ক-সাপেক্ষ বলিয়া ইহা বোধশক্তির আধার; এ জন্য ইহাকে মন ও বুদ্ধিস্থানও বলিয়া থাকে। শরীরের সার অংশ ও জীবনীশক্তির উৎস বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে করোটির অস্থিময় নিভৃত গহ্বরে মস্তিষ্ক রক্ষা করিয়াছেন। ইতর ও শ্রেষ্ঠ সকল জন্তুরই মস্তিষ্ক আছে। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক বড়। স্বর্গীয় বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক দরকেভিচ মস্তিষ্ক-তত্ত্ব অনুসন্ধান

করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুরুষের মস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা গড়ে ১৩৫ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় তিন ছটাক অধিক ভারী। ব্যবচ্ছেদবেত্তা বিস্চক্ বলেন যে, নারী-জাতির মস্তিষ্ক পুরুষজাতির মস্তিষ্ক অপেক্ষা নবমাংশ হইতে দ্বাদশাংশ অল্প। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সভ্যতার তারতম্যে মস্তিষ্কের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বর্ব্বর অষ্ট্রেলিয়াবাসী পুরুষের মস্তিষ্ক তত্রত্য নারীর মস্তিষ্কাপেক্ষা ·১০৭ কিউবিক সেন্টিমিটর বড়। সেন্টিমিটর প্রায় ·৩৯ ইঞ্চ দীর্ঘ। অর্দ্ধসভ্য মিসরদেশীয় পুরুষের মস্তিষ্ক স্ত্রীর মস্তিষ্কাপেক্ষা ·১৩৭ সেন্টিমিটর, এবং সভ্যতম পারিস নগরবাসী ফরাসীর মস্তিষ্ক তত্রত্য সভ্য রমণীর মস্তিষ্কাপেক্ষা ·২২২ সেন্টিমিটর বৃহৎ। ইতর জন্তুদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণ এই প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে।* যথা—

বিড়াল—ইহার মস্তিষ্কের গুরুত্ব		২৮	গ্রাম।
কুকুর ...	মস্তিষ্কের গুরুত্ব	৮০	গ্রাম।
মেষ ...	” ”	১২০	”
সিংহ ...	” ”	২৫০	”
গরিলা (বনমানুষ)	” ”	৪৫০	”
বৃষ ...	” ”	৫০০	”
ঘোটক	” ”	৬৫০	”
মনুষ্য ...	” ”	১৩৬০	”
তিমি ...	” ”	২৮০০	”
হস্তী ...	” ”	৭৬০০	”

শরীরের পরিমাণে মস্তিষ্কের গুরুত্বের তারতম্য।

কচ্ছপের মস্তিষ্ক তাহার শারীরিক গুরুত্বের		১/২২৪০	অংশ।
বৃষের	”	১/৮৬০	”
হস্তীর	”	১/৫০০	”
বানরের	”	১/৮০	”
মেকেকোর (মেক-শুকপাখী)		১/৯০	”
মনুষ্যের	”	১/৪০	”
চটক পক্ষীর	”	১/২৫	”
সিম্পাঞ্জির (বনমানুষ)		১/২৪	”

* Scientific American 13-2-1897.

নূতন সংবাদ।

১। আলিপুরের পশুশালায় সম্প্রতি একটি হাতীর বাচ্চা হইয়াছে, আর একটির বাচ্চা শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা।

২। লর্ড কর্জ্জন ইতিমধ্যে একদিন চুপে চুপে কালীঘাটের মন্দির দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

৩। লর্ড কর্জ্জনের খিদমৎকার তাঁহার গৃহ হইতে দুইটা রূপার বাতিদান ও আরও কতকগুলি জিনিষ চুরি করিয়া এক পোদ্দারের দোকানে বন্ধক দিয়াছিল, ধরা পড়িয়াছে।

৪। যদি কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, মান্দ্রাজের গবর্ণর-পত্নী লেডি আম্পহিল

অগ্রে এবং লর্ড আম্পহিল দুই সপ্তাহ পরে সিমলা যাত্রা করিবেন। লর্ড কর্জ্জন যদি বিলাত যান, তাহা হইলে লর্ড আম্পহিল তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৫। মান্দ্রাজে শিক্ষিতা ধাত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য লেডি আম্পহিল সচেষ্ট হইয়াছেন।

৬। একটি নূতন দাতব্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য আজীমগঞ্জের বাবু ধনপৎ সিং নৌলাখা ১৫০০০ হাজার টাকা দান করাতে ছোট লাট বাহাদুর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

৭। আঙ্কল টমস্ ক্যাবিনের প্রকাশক চার্লস হেনরী ক্লার্কের ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৮৫২ সালে ১ বৎসরের মধ্যে এই পুস্তক বার লক্ষের অধিক বিক্রয় করিয়া দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা খরচ খরচা বাদে লাভ করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে গ্রন্থকর্ত্রী বিবি ষ্টৌকে হাজার গিনি পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহার পিতা কাপ্তেন জেমস্ ক্লার্ক কোপেনহেগেনের যুদ্ধে লর্ড নেলসনের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন।

৮। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার পেড্লার সাহেবের বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর অতীত হওয়াতে কার্য্য হইতে অবসর লইবার কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধীয় নূতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আর দুই বৎসরের জন্য কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

৯। রুষিয়ার সম্রাট আডমিরল্ ম্যাকারফকে নৌসেনার অধিনায়ক এবং কুরুপ্যাটকিনকে প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

১০। গত ১লা এপ্রিল লর্ড কার্জ্জন বর্দ্ধমান ভ্রমণে গিয়া মহারাজাধিরাজের অতিথি হইয়াছিলেন।

১১। গত ৭ই চৈত্র কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১২। গত ৭ই এপ্রেল বঙ্গের ছোট লাট দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন।

১৩। ঢাকার নবাব খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর বড় লাটের বাটীতে (Private) গোপনে যাইবার অধিকার পাইয়াছেন।

১৪। আণ্ডামান দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিনা তারে সংবাদাদি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

১৫। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক নগরে একটি স্নানাগার হইয়াছে। তথায় দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান হয়। দুগ্ধে স্নান করিলে রং ফরসা হয় বলিয়া মার্কিণ রমণীগণ দলে দলে স্নান করিতেছেন।

১৬। গত ২৬শে মার্চ্চ সার হেনরী কটনের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।

১৭। লালদীঘির প্রাঙ্গণে দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা লক্ষীশ্বরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

১৮। এ দেশে শিল্পাদি শিক্ষার সহায়তার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় একটি

সভা স্থাপিত হইয়াছে। সুবিদ্বান্ বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাহার সম্পাদক। অনেক কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহাতে উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছেন।

১৯। বেথুন কলেজ কমিটী বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকে কমিটীর নূতন সভ্য মনোনীত করিয়াছেন।

২০। কলির দাতা কর্ণ এণ্ড্রু কার্ণেজি ফিলাডেলফিয়া নগরে ৩০টী পাঠশালা নির্ম্মাণার্থ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২১। মান্দ্রাজের গবর্ণর মান্দ্রাজ নগরে কুকুরাশ্রম নির্ম্মাণার্থ ২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২২। গত দশ বৎসরের মধ্যে গ্রেট-ব্রিটেনে নিদ্রিত জননীর শরীরের চাপে অন্যূন ১৫ হাজার শিশু সন্তান মারা পড়িয়াছে। জর্ম্মণিতে ২ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক শিশুর সহিত একশয্যায় রাত্রিকালে কাহাকেও শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। ইহাতে উক্তরূপ শিশুহত্যা দুর্ঘটনা ঘটে না। এদেশে এরূপ দুর্ঘটনা অনেক ঘটে, তাহার প্রতিবিধানের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম এ, প্রণীত; এস্. কে লাহিড়ী এবং কোং দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য ২৲ টাকা। গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ এবং সুন্দররূপে মুদ্রিত। ইহাতে বঙ্গের প্রসিদ্ধ লোকদিগের ৩৫ খানি সুন্দর ছবি আছে। রামতনু বাবু যেমন আদর্শ চরিত্রের লোক, তাঁহার জীবনী পণ্ডিত শাস্ত্রীর দ্বারা লিখিত হইয়া তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং বর্ণিত ঘটনা সকল এরূপ ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহাতে সাধারণের শিক্ষা ও চরিত্রোন্নতির সহায়তা হয়। সামান্য সামান্য ঘটনা ও তারিখাদিতে কিছু কিছু ভুল দৃষ্ট হইল, আশা করি বারান্তরে তাহা সংশোধিত হইবে। রামতনু বাবু যে কৃষ্ণনগরে ও লাহিড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ইতিবৃত্ত আমূল বর্ণিত হইয়াছে। রামতনু বাবু কিরূপ দারিদ্র্য ও বাধাপ্রতিবন্ধকের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা ও চরিত্র সংগঠন করেন, কিরূপ নৈপুণ্য ও সুযশের সহিত অধ্যাপকতা কার্য্য সম্পন্ন করেন, যখন যেখানে ছিলেন আপনার সরলতা, সত্যপরতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, সৌজন্য ও চরিত্রবলে কেমন সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, ভ্রাতৃবিয়োগ, পুত্রকন্যা-বিয়োগ, স্ত্রীবিয়োগ প্রভৃতি পারিবারিক

নানা দুর্ঘটনা ও ঘোর পরীক্ষার মধ্যে কিরূপ ঈশ্বরনির্ভর ও বিশ্বাসবলের পরিচয় দিয়াছেন, এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর ও উন্নতিকর কার্য্যে কিরূপ প্রাণের সহিত যোগদান করিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি কেবল জীবনী নহে, আধুনিক বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। ইহাতে সাধারণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বঙ্গসাহিত্যসমাজের পূর্ব্বাবস্থা ও সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজী শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা তাহার সংস্কারার্থ বিবিধ চেষ্টা, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতির স্থূল বিবরণ আছে এবং যে সকল মহাপুরুষ গত ১০০ বর্ষে বঙ্গসমাজ ও বঙ্গসাহিত্যাদির সংগঠনকর্ত্তা, তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন, বক্তা রামগোপাল, নাটককার রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, উপন্যাসলেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির বিশেষ বৃত্তান্ত আছে।

এরূপ পুস্তক প্রত্যেক বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর পাঠ্য। এতৎপাঠে সকলেই মহোপকার লাভ করিতে পারিবেন।

২। বীরকুমার-বধ-কাব্য — "কাব্যকুসুমাঞ্জলি", "কনকাঞ্জলি" প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমানকুমারী প্রণীত ও শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রকাশিত, মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীমতী মানকুমারী তাঁহার সরল, মধুর ও স্বভাব-স্ফূর্ত্ত কবিতার জন্য বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। এতদিন তাঁহার খণ্ড কবিতা সকলই লোক-চক্ষুর গোচর হইয়াছিল—এখন একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ জনসমাজকে উপহার দিয়া তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতার্হ ও কবি-যশোভাজন হইলেন। এই গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার রসজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বাগ্বৈচিত্র, চরিত্র-চিত্রাঙ্কনপটুতা এবং সর্ব্বোপরি অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের জয়সংস্থাপনের স্থির লক্ষ্য দর্শন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছি, তাহা বর্ণনীয় নহে। লেখিকা মিত্রাক্ষর ছন্দরচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁহার পিতৃব্য কবীন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুসরণে বর্ত্তমান গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া পিতৃব্যের মুখ যে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহাকে নিরাময় ও দীর্ঘজীবিনী করুন এবং তাঁহার লেখনী হইতে এইরূপ সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ সকল আরও বাহির করিয়া বঙ্গরমণীদিগের গৌরববৃদ্ধি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সহায় হউন্।

কাব্য সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রকাশক কবিরত্ন মহাশয় যে সমীচীন সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুষ্ঠু। তাহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

"অভিমন্যু কথা মহাভারতের একটী প্রধান ঘটনা। অভিমন্যুকথা শোকার্ত্ত মানবের সান্ত্বনাস্থল।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে নিয়তি কেন বাধ্যতে॥

অভিমন্যু-নিধন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। আসক্তি ও অভিমানের উপর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। বৈরাগ্যই মহান্ ধর্ম্মের সিংহাসন। অভিমন্যু-নিধনে পাণ্ডব-হৃদয়ে একটী গভীর বৈরাগ্যের ছায়া পতিত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা জয়োল্লাসে স্ফীত হন নাই; তাঁহারা সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও মত্ত বা বিচলিত হন নাই। দ্যূতক্রীড়া ব্যসনমধ্যে পরিগণিত, সর্ব্বদা পরিহার্য্য। যিনি যুধিষ্ঠির দ্বারা জগতে ধর্ম্মসেতু বন্ধন করিবেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু-নিধন ঘটাইয়া, ভক্ত যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি চিরকালের জন্য ঘুচাইয়া দিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী অভিমন্যু-বধ কাব্যের উপসংহারে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় এ বিষয়টী বুঝাইয়াছেন।

'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' এই মহাবাক্য—এই সার সত্যই এ কাব্যের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থকর্ত্রী তাহা অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, অতি মধুরভাবে বুঝাইয়াছেন। 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।' গ্রন্থকর্ত্রী প্রতিভাবলে নব নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক চরিত্রেই এই মহান্ সত্যকে পাঠকের প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া দিয়াছেন।

এই মহাকাব্যের কবি সাত্ত্বিক প্রকৃতির কবি; এই জন্য ইঁহার কাব্যে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, গান্ধারী প্রভৃতির চরিত্র ব্যাসবর্ণিত সেই সেই চরিত্র হইতে বিভিন্ন হয় নাই, বরং কোনও কোনও চরিত্র মূল মহাভারত হইতে উজ্জ্বলতর।

এই কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে চিত্ত সেই অপার্থিব সাত্ত্বিক রস আস্বাদন করিয়া পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হয়, অলৌকিক বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া অসীম মঙ্গলের পথে প্রসারিত হয়। অতএব সৎকাব্যের চরম উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।"

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, "বীর-কুমার-বধ কাব্য" যখন মুদ্রিত হইতেছিল, তখন কুচবিহারের মহারাজা ইহার কয়েক ফরমার প্রুফ দর্শনে প্রীত হইয়া গ্রন্থ-কর্ত্রীর উৎসাহবর্দ্ধনার্থ ১৫০ টাকা দান করেন। এই পুস্তকখানি সুন্দররূপে মুদ্রিত করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা আশা করি, গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই এই অপূর্ব্ব কাব্যখানির প্রচারার্থ যথা-সাধ্য উৎসাহ ও সাহায্যদানের ত্রুটি করিবেন না।

বামারচনা।

বাসন্তী নিশায়—প্রান্তরে।

এ কি ?
আজ ধরা ডুবে গেছে, কোন্ শোভাতে ?
মধুর মলয় মৃদু মৃদু পদে,
এসেছ কাহার হৃদি কোকনদে,
আকুল হৃদয় জুড়াতে ?
শত কুমুদীর বিরহ-বেদনা,
জুড়াইতে লয়ে অমল জোছনা
অবনীর অমা হরিতে।
শশাঙ্ক নির্ম্মল নীল নীলিমায়
ভাসিতেছে মরি কার করুণায়,
কাহার চরণে নমিতে ?
নির্জ্জন বন, উপবন, গিরি,
নীরবে ছড়ায় কাহার মাধুরী—
গম্ভীর, সুপ্ত, অলসা ?
আরতি করিছে শত দীপ জ্বালি,
স্নিগ্ধ নিশীথে, তারকাবলী—
ধ্যানে ধরি কার লালসা ?
রেণুময় পীতবক্ষ বিছায়ে
প্রান্তর—তন্থ পড়েছে এলায়ে
পথিক নয়ন লোভাতে।
কোথাও শ্যামল, নব তৃণদল,
মাখিয়া নিশির নীহারাশ্রু-জল
ঘুমায় অতুল শোভাতে।
আঁকিয়া বাঁকিয়া রাজপথখানি
চলিয়াছে যেন ম্লান উদাসিনী
নগর তেয়াগি কাননে।
শত পাদপদ বক্ষে ধরিয়া,
অলস প্রাণ গিয়াছে বহিয়া,
বুঝি কোন গূঢ় কারণে।
পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ উচ্চ তরুদল,
দূরিতে সতত আতপ অনল
অদ্ভুত হস্ত বিসারি।
অতি প্রিয়তম বান্ধবের মত,
জুড়াইছে তার স্নেহে অবিরত
বিনত হৃদয় প্রসারি।
চারি দিকে এক স্তব্ধ মহান্
নীরব মাধুর্য্য রয়েছে শয়ান
মগ্না বিভোর ধরণী।
চিন্তা-শ্রম-হরা অঞ্চল বিছায়ে,
বিশ্বদেবে যেন হৃদয়ে শোয়ায়ে,
ঘুমায় বিশ্ব-ধরণী।
মরি ! এ মধুর শীতল পবন
উন্মুক্ত, বিশাল, অমল, গগন,
কি বিশাল ভাব বহিয়া।
ঢালে প্রসন্নতা মর প্রাণে ধীরে,
হীন অবসাদ মুক্ত পূত নীরে
দূরি দুয়ে—যেতে ক্ষালিয়া।
খুলে যায় প্রাণ, থেমে যায় গান,
রহে না হেথায় মান অপমান,
যেথা বিমোহিনী প্রকৃতি।
নগ্ন শোভন সৌন্দর্য্যে সাজিয়া,
শত দীপ্ত দীপ হৃদয়ে জ্বালিয়া,
ব্রহ্মে করিছে আরতি।
যোগী জন জাগে সমাধিতে মন,

ধোয়ার বাঞ্ছিত আরাধ্য চরণ,
এ বাঞ্ছিত মুক্ত অনিলে,
সুবিমল নিশা আলোক-প্রকাশি
মগ্ন করে যত সালোক্য পিপাসী,
ঈপ্সিত শান্তি সলিলে।

চির মায়াবদ্ধ ভ্রান্ত নর নারী
চৌদিকে হেরি মহিমা তাঁহারি
মুহূর্ত্তে আপনা ভুলে।
দিগদিগন্তরে অসীম বাসনা
প্রদানে তাদেরও লুকান বেদনা
তাঁহারি চরণমূলে।

শিল্প শোভা হতে আঁখি ফিরাইয়া
দূর জনস্রোত পশ্চাতে ফেলিয়া
বারেক এ নব মহিমা।
আঁখি পরে যায় হয় প্রতিভাত,
ভোলে সে ধরার ঘাত প্রতিঘাত,
ভাবি অসীমের অসীমা।

ভাবদৃষ্টিহীন আঁখি তাও ঢাকা,
পরতে পরতে শত যবনিকা
কুহেলিকা-মাখা পৃথিবী,
কি শুভ মুহূর্ত্ত কচিৎ কখন(ও)
ঘুচালে দারুণ নয়নবন্ধন
হরব ধন্যা মানবী।

স্বর্ণ ভারত শস্যশ্যামলা,
স্নিগ্ধ উজ্জল সুজলা সুফলা
জ্যোৎস্না পুলক বসনে।
কি নব সৌন্দর্য্য কত শোভাময়,
হেরে জগতের প্রাণী সমুদয়
প্রীতি পরিপ্লুত নয়নে
কেবল মায়ের অভাগী দুহিতা
শতাবগুণ্ঠনে হয়ে আবরিতা
সৌধ বা কুটীরমাঝারে।

প্রিয় অনুরোধ পালে ধীর মনে,
আঁখি নত ক'রে স্তব্ধ গৃহকোণে
কভু আলো, কভু আঁধারে।
সীমাবদ্ধ এক সাম্রাজ্যের মাঝে
সকলেই রত আপনার কাজে,
দীনা হীনা কিবা মহিষী।

"উন্মুক্ত আকাশ"—গৃহ-চন্দ্রাতপ,
নাইক' সেথায় শীত বা আতপ
পোহায় দিবস সুনিশি।
"মহীরুহ" তথা উচ্চ প্রাচীর
সভয়ে অনিল বহয়ে সুধীর
প্রাঙ্গণ-পুষ্প বিকাশি।

এ জীবন বদ্ধ পতি, পিতা, পুত্রে,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা সেই সূত্রে,
হয় না অন্যত্র উদাসী।
প্রকৃতির এই অবরুদ্ধ বালা,
তার চোখে আজ সুষমার ডালা,
কে ধরেছে বল খুলিয়া!

অন্ধ চক্ষু মেলে কি দেখিছে চেয়ে?
এ যে মা তোমার কারাবাসী মেয়ে
এসেছে শৃঙ্খল টুটিয়া।
মুক্ত আকাশ—মৌন জগৎ
যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ,
দাও তবে প্রাণে ভরিয়া।

এ মধু মুহূর্ত্তে—হে প্রকৃতি রাণি!
খুলে দাও বক্ষ—লও সেথা টানি
হরষ-অশ্রু মুছায়ে।
এ চির-জড়তা ভীতি অবসাদ
ক্ষণেকও রহি গো ভুলিয়ে।

শ্রীমতী সরসীবালা, শাহারণপুর।

নীহারে সিক্ত শুষ্ক গোলাপ।

সবুজ পাতার তলে ওরেরে গোলাপ!
কেন লজ্জা-নম্র-মুখী,
কেন জলে পূর্ণ আঁখি,
কি দুঃখেতে করিছ দুঃখের বিলাপ?

সবুজ পাতার তলে ও প্রিয় গোলাপ!
দেখে তব শুষ্ক মুখ,
বড়ই হইল দুখ,
কেন হইয়াছ শুষ্ক? কে দিয়েছে শাপ?

কোথায় গোলাপ তোর সে সুখের দিন,
যে গিয়েছে কাছ দিয়ে,
দেখিয়াছে চেয়ে চেয়ে,
ফিরেও না চায় এবে দেখিয়ে মলিন।

সে সুখের দিন তোর কোথারে গোলাপ!
ফুল! তব মধু যেচে
ভ্রমর আসিত কাছে,
সে দিন কেনরে গেল? কি করেছ পাপ?

সে সুখের দিন তোর কোথারে গোলাপ!
তোর যে গন্ধের বাসে,
গগনের বিধু হাসে,
কোথায় গেলরে তোর সে সব প্রতাপ!

পাইয়ে সুগন্ধ তব সান্ধ্য সমীরণ
আহ্লাদ-সাগরে ভাসি
ধীরে তব কাছে আসি
সাদরে চুম্বিত তব সুচারু বদন।

সে সুখের দিন তোর গিয়াছে ভাসিয়া,
দেখ ঐ পুষ্পগাছে
গোলাপ ফুটিয়া আছে,
গন্ধে মধুকরগণ আসিছে ধাইয়া।

নিকটে যাইয়ে তার সরস পবন
হাসি আনন্দের হাসি
লইয়ে সুগন্ধিরাশি,
চারি দিকে করিতেছে অমৃত সিঞ্চন।

উহারো হইবে দশা তোমারি মতন,
ফুরাইবে যত সুখ
শুকাবে সুন্দর মুখ,
ফুরাইয়া যাবে বর্ণ কান্তি সুশোভন।

কুমারী সুরুচি,
মেদিনীপুর।

১৩১০ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।		বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা ...	৪
নববর্ষ ...	২	শিক্ষিত মহিলার দায়িত্ব	৩১
		দেরাদুনে কন্যাপাঠশালা	১০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীশিক্ষা ...	১০০
বামাবোধিনীর একচত্বারিংশ-জন্মোৎসব	১২৯
প্রেমগাথা ...	১৩১
প্রার্থনা ...	১৩৩
বামাবোধিনীর জন্মোৎসব-সম্মিলন	১৩৪
নব্য বঙ্গ-মহিলা ...	১৭৯
শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব	৩৪২

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

বিষয়	পৃষ্ঠা
একটু পূর্ব্বস্মৃতি ...	৪৫
সুমাতা ...	৮৯
বিবিধ অগ্নিসংস্কার ...	৯৯
দান-যজ্ঞ ...	১৩৭
আশ্চর্য্য স্বামিভক্তি ...	২৪৭
বিবি বেসান্টের বক্তৃতা	২৬৬
করমেতি বাই ...	২৯৭
স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে	৩০৪

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বীর-পূজা ...	৯
গীতাসার ব্যাখ্যা	২০, ১৫২, ২৩৪, ৩০০
নবীন ভারতী	২২, ১৮২, ৩৩৮
ঈশ্বরের নামাবলী	৪৪, ১১৩, ১৮৫, ২১৮, ২৪৯, ৩১৪, ৩৪৭
মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যাখ্যান ...	৬৯
জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন (পূর্ব্বজন্ম)	৮৪
অমরত্ব ও নারীধর্ম্ম ...	৮৬
মহদ্বাক্য ...	১১১, ১৪৮
গুরুভক্তি ...	১২২
পৌরাণিক কথা—উমাব্রত	১৩৯
সুমাতার জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথা	১৭২
সতীর প্রতিজ্ঞা ...	২৪৩
মৃত্যু বা নিভৃত চিন্তা ...	২৭০
উদাসীনের চিন্তা ...	২৯১
গার্হস্থ্য জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্য	৩০৬

৪। সমাজ ও গৃহধর্ম্ম।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবাহ ব্যয় ...	৩৯
গৃহকার্য্য ...	৪৮
দাহ না সমাধি ...	১৯৬
ভাইফোঁটা ...	২০৩
ভুক্তপোষ্য বিধবা ...	২২৬
মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষা চর্চ্চা	২২৮
কায়স্থ মহিলাগণের সমীপে নিবেদন	২৪৫
হিন্দু-বিধবা ...	২৫৯
বিধবা-বিবাহের উপসংহার	৩৫২
আমাদের দেশের কি হইল ?	২৬৩
নূতন ও পুরাতন প্রভু ও ভৃত্য	২৭৫, ৩২৫
গৃহ-চিকিৎসা—মুষ্টিযোগ	৪২, ১২০

৫। ইতিহাস, জীবনচরিত ও ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফা-হিয়ান ...	১২, ৬৭
লোহানী বণিক ...	১৬
শিষ্যকর্ত্তৃক গুরুর উদ্ধার	৭৯
পাশ্চাত্য প্রাচ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	৯১, ২১৫, ৩০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
দয়ানন্দ সরস্বতী	১০৮, ১৮৪
স্বর্গগত কবি হেমচন্দ্র ...	১৭৭
মৌনিসভা ...	২৩১
নানক ...	২৬১
মৃত্যুসম্বন্ধে বিশ্বাস ...	২৯৪
ঐতিহাসিক উপন্যাস—পরাজয়	১৬৮, ২০০
কোরিয়ার সহিত জাপান ও রুসিয়ার সম্বন্ধ	৩২৩
নলিনীর শিক্ষা ...	৩৬৪

৬। দেশভ্রমণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিমাচলের কাকু ...	১৯
জীবনের একদিন ...	২৬
ভারতীয় পুণ্যনদী	৫৩, ১১৪, ২৮৯, ৩৫৭
বনবাসিনীর পত্র ...	৫৭, ২৮৩
আমেরিকার পত্র (ইংরাজী)	৬৩
কপিলেশ্বর ...	১০৪
বঙ্গনারী ...	২১০
পত্র ...	২৩৯
ডুমরাওন ভ্রমণ ...	২৮১
পালামৌর বন্যজাতি ...	৩১১, ৩৭১
পত্র ...	৩৩৩
রেলওয়ে হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের অপকারিতা	৩৬৩

৭। বিজ্ঞান।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিজ্ঞান-রহস্য ...	৪৯, ৩৭৩
দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ ...	৭৪
প্রাণিতত্ত্ব ...	৮২
শীলমৎস্য ...	১১৮
রসায়ন বিদ্যা—নাইট্রোজেন	১৪৩
ঐ কার্ব্বণ ...	৩৪৮
চতুর্দ্দশ ভুবন ও জীবদেহ ...	১৪৫

৮। পদ্য।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনন্ত ...	৮
ইলিয়ড	১১, ১১৭, ১৪৬
বিসর্জ্জন ...	১২
আদর্শ রমণী ...	৩৭
সাধুবচন-সংগ্রহ ...	৩৮, ৮৭, ১৯৮
শোক-গাথা ...	৪৩, ৭৭
কালের খেলা ...	১০৫
জ্যোতি ...	১২১
শরৎ-পূর্ণিমা রজনী ...	১২০
চৈতন্যাষ্টকম্ ...	১৫০
সুভদ্রা ...	১৫৯
বঙ্গনারী-সঙ্গীত ...	১৮৬
ধর্ম্মরাজ্য ...	২০৮
সংসার-লীলা ...	২০৮
অপরাজিতা ...	২১৩
আকাঙ্ক্ষা ...	২৩৩
মিলন ...	২৩৫, ৩৩৫
দশা কি হইল ? ...	২৬৫
চিত্তপ্রসাদ ...	২৮৬
সুখের জীবন ...	৩১৩
আমার দাদা ...	৩৩১

৯। বিবিধ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা ...	১
বিবিধ তত্ত্ব ...	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাব্যবোধ	৫১, ৮৮, ১৭৬
পত্রাবলী	৭১
সিগারেটের অপকারিতা	৭৫
বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ	১৫৪
রচনা-রীতি	১৯৪
বঙ্গ দ্বিধা হও	৩০৮
রুষজাপান যুদ্ধ	৩০৯
পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতীর স্মারক কীর্ত্তি	৩৬৯

১০। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৯৪, ২২০, ২৫৩, ৩১৬, ৩৭৬।

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

৩, ৬৫, ৯৭, ১৩৫, ১৯৩, ২২৫, ২৫৭, ৩২১।

১২। নূতন সংবাদ।

৫৯, ৯৩, ১২৪, ১৮৭, ২১৯, ২৫০, ৩১৪, ৩৭৪।

১৩। বামারচনা।

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবাহন গীতি	৬০
নববর্ষের প্রার্থনা	৬১
কোথা মম গেহ	৬২
করুণা তোমার	ঐ
কবি বিদায়	৯৫
প্রীতি উপহার	৯৬
শিশু	১২৬
অমানিশায় কর্ত্তব্য আবাহন	১২৭
শুভ বরষার দিনে	ঐ
কুন্তলীন	১২৮
জননী	১৮৮
জ্যোৎস্নার জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ কামনা	১৯০
সে কথা তুল না	ঐ
আত্মসমর্পণ	১৯১
মর্ম্মগাথা	১৯২
স্মৃতি	ঐ
আহ্বান	২২১
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়	২২২
ভাইদ্বিতীয়া	২২৩
কাঙ্গালের আবাহন	ঐ
একটী নবজাত শিশুর জন্মোপলক্ষে	২২৪
অমিয়া আমার	২৫৪
শিশুর হাসি	২৫৫
অনিত্য সংসার	ঐ
নীরব	৩১৭
বিদায়ী পূর্ণিমা	ঐ
যায় দেবী যায়	ঐ
স্মৃতি	৩১৮
ব্যর্থ আশা	৩১৯
করুণা সুন্দরী	৩২০
বাসন্তী নিশায়—প্রান্তরে	৩৭৯
নীহারে সিক্ত শুষ্ক গোলাপ	৩৮১